বিনিময়

পুষ্পলতা দেবী

১৩৪৭

ভূমিকা

'পুষ্পচয়ন' এবং 'নীলিমার অশ্রু' পাঠক-সমাজে যেরূপ আশাতীত সমাদৃত হইয়াছে, আশা করি, 'বিনিময়'খানিও সেইরূপ আদৃত হইবে। এই 'ফ্রয়েডী'-নারী-প্রগতির দিনে আমার গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রগুলি পাঠকবৃন্দের যে এতখানি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে যে আনন্দ প্রদান করিতে পারিয়াছে, তাহা কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা শিবম্।

জন্মাষ্টমী
১০ই ভাদ্র, ১৩৪৭

লেখিকা
শ্রীপুষ্পলতা দেবী

বিনিময়

প্রফুল্লতা দেবী

১

শ্বশুরের পয়সাতে অনেকেই যেমন বিলাত যায় কোন একটা কৃষ্ণ-বিষ্ণু বনিয়া আসিতে, শৈলও তেমনই গিয়াছিল! ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা গল্প করিবার কিছুই ছিল না। তথাপি এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটুকু যে জন্মলাভ করিল, তাহার কারণ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার একটা বৎসর বাকী থাকিতে শৈলর আকস্মিক পত্নী-বিয়োগ ঘটিল।

দুঃস্বপ্নের মত এই নিষ্ঠুর সংবাদটা প্রচণ্ড সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার নিকট তারযোগে ছুটিয়া আসিল,—'সুনীলা নাই!'

শৈল বসিয়া পড়িল। আলোকিত কক্ষটা এক নিমেষে যেন তাহার চোখে অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে শোক করিবার বা মৃত্যুর জন্য অশ্রু ত্যাগ করিবার অবকাশ দিল না। শৈলর প্রথমেই মনে পড়িল, ল্যাণ্ড-লেডীর তাগিদের কথা! তাহার কাছে ল্যাণ্ড-লেডীর অনেকগুলি টাকা পাওনা। প্লাটফরমে গাড়ী থামিলে পথ খোলা পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ভীড় করিয়া সকলের আগে নিজেরা উঠিবার জন্য পরস্পরকে যেমন দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে ইতস্ততঃ

করে না, সেই ভাবে অসংখ্য চিন্তা মনের কোণ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার মস্তিষ্ককে পিষ্ট—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

প্রাতরাশ টেবলের উপর পড়িয়া রহিল। শৈল আস্তে আস্তে উঠিয়া কৌচের উপর শুইয়া পড়িল। স্বদেশে বা বিদেশে এমন কোন আত্মীয়-বান্ধব বা পরিচিত কাহাকেও শৈলর মনে পড়িল না, যাহার কাছে দেশে ফিরিয়া যাইবার শুধু পাথেয়টুকুর জন্য সে হাত পাতিতে পারে।

কূল নাই! কিনারা নাই! ক্ষিপ্তোন্মত্ত সমুদ্রের জলরাশির মত ভীতিসঞ্চারক দুর্ভাবনারাশি শুধু শৈলর চোখের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

শ্বশুর ব্রজমোহনের প্রকৃতির সহিত শৈল পরিচিত ছিল না। অষ্ট-মীর পরের দিন সে ইংলণ্ডে চলিয়া আসিয়াছে। অন্তরে স্নেহের বাঁধন, ভালবাসার দাবী সেখানে জন্মিবার অবকাশ ঘটে নাই। আজ তাঁহার কন্যা জীবিত নাই। জামাতার প্রতি স্বার্থ শেষ হইয়া গিয়াছে। অকারণ কেনই বা তিনি পরের জন্য আর টাকা ব্যয় করিবেন? শৈল এইটাকেই নিশ্চিত করিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলি তাহার ভালই ছিল। তাহারই জোরে স্বদেশে অনায়াসে সে কোন একটা কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিত। কয়েক বৎসর ধরিয়া হাতে কিছু মোটা রকম জমাইয়া ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ন করিতে আসিলে, আজিকার মত এমন অসহায় বিপন্ন অবস্থা কি উদ্ভব হইতে পারিত?

শৈলর চোখে জল আসিল। এই বুদ্ধিকেই সে সম্বল করিয়া, কল্পনায় ভবিষ্যতের মর্ম্মর-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিল! সময় কাহারও মুখ চাহিয়া এক পল দাঁড়াইয়া থাকে না। শৈলর জন্যও রহিল না।

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া মাসটা প্রায় কাটিয়া আসিল। ভারতের মেল আসিল, শৈল শ্বশুরের নিকট হইতে পত্র পাইল। ব্রজমোহন কন্যার জন্য কোন শোকপ্রকাশও করেন নাই। জামাতাকে কোন সান্ত্বনার বাণীও লেখেন নাই। শুধু লিখিয়াছেন, শৈল যে ভাবে টাকা পাইতেছিল, সেই ভাবেই টাকা পাইবে। সে যেন মন দিয়া অধ্যয়ন করে।

পত্রখানা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈলর মুখ দিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড দুঃখে নহে। গভীর আরামে! দুর্ভাবনার গুরুভারটা কাঁধের উপর হইতে নামিয়া গেল বলিয়া। শ্বশুরের এই মহানুভবতা স্মরণ করিয়া ব্রজমোহনের চরণে পরম শ্রদ্ধায় তাহার সারা চিত্ত আছাড় খাইয়া পড়িল।
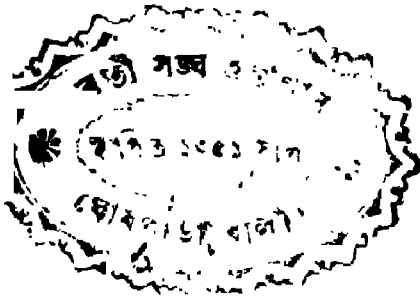
২

এক বৎসরের কিছু বেশী কাটিয়া গিয়াছে।

শৈল—মিঃ এস, এন, রায়, বার-এ্যাট-ল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ব্রজমোহন নিজে গিয়া হাওড়া ষ্টেশনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনেকগুলি বৎসর পরে শ্বশুর-জামাতাতে সাক্ষাৎ হইল। ব্রজমোহন স্নেহ-সম্ভাষণ করিলেন; কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। শৈলর কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল।

শৈশবে শৈলর পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল। মামার বাড়ী মানুষ হইয়া পিতৃ-গৃহের সম্বন্ধটা তাহার নিকট অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার মা-ও স্বামি-শোকের হাত হইতে মুক্তি লইয়া স্বর্গে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাই মাতুলালয়ের বাঁধনটা শৈলর শিথিল। তথাপি মামাত' ভায়েরা নৈহাটী হইতে তাহাকে লইতে আসিয়াছিল। শৈলকে দেখিয়া তাহারা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।

ব্রজমোহন মোটরের দরজা খুলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বাবাজী কি আমার ওখানে নাম্‌বে?"

শৈলর বুকের মাঝটা ধক্‌ করিয়া উঠিল। ছয় বৎসর আগেকার ছবিটা চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। আই, সি, এস,

পরীক্ষার নিমিত্ত যেদিন সে বোম্বে রওনা হইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে শ্বশুরের গাড়ীতেই আসিয়াছিল। পাশে ছিলেন স্বয়ং শ্বশুর। আজিও তিনি সশরীরে আসিয়াছেন। তাঁহার গাড়ীও আসিয়াছে। কিন্তু সেদিনে, এদিনে ব্যবধান যেন সমুদ্রবিশেষ। আজ 'এস' বলিয়া জামাতাকে পাশে বসাইবার দাবী তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

মামাত' ভায়েদের নমস্কার করিয়া শৈল কহিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার ওখানে যাব মাকে প্রণাম কর্ত্তে।

ব্রজমোহনের মোটর তাহাকে বহন করিয়া সুবৃহৎ প্রাসাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলর মনে পড়িল, তাহার বিদায়ের দিনে এই ফটকটি লতাপাতা-পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল; আর সম্মুখের ওই গাড়ী-বারাণ্ডার উপর শ্বশুর-ভবনের আত্মীয়া মহিলার দল ভীড় করিয়া জড় হইয়াছিলেন। পাশের ঐ রেলিংটা ধরিয়া নীরবে বিষণ্ণ আননে দাঁড়াইয়া ছিল সুনীলা। আট দিনের পরিচিত স্বামীকে বিদায় দিতে তাহার আয়ত নেত্র হইতে কি অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িয়াছিল? সে কথা শৈলর আজও যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

ব্রজমোহন জামাতাকে লইয়া আসিলেন, চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভেতরে খবর দে জামাইবাবু এসেছেন।" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"এ বেলাটা এখানে তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, শৈল!"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ভিতর হইতে চা আসিল। সুবৃহৎ রূপার রেকাবী ভরিয়া জলযোগের আহার্য্য আসিল। কিন্তু সব বহিয়া আনিল চাকর। শৈলর পাশের টেবলটার উপর সেগুলা রাখিতে বলিয়া ব্রজমোহন

কহিলেন,—"নাও, বাবা! কিছু খেয়ে নিয়ে তার পর স্নান করতে যাবে।"

ভাঙ্গা জিনিষকে গোটা করিয়া সাজাইয়া রাখিবার দুঃখ অনেকখানি। শৈল প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সহজ অবস্থায় আনিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু ভিতরের আড়ষ্ট ভাবটা তাহার কিছুতেই কাটিতেছিল না। মনে ইচ্ছা জাগিতেছিল, এক ছুটে মামার বাড়ী গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া দু'টো গল্প করিয়া সে একটু স্ফূর্ত্তি করে। দীর্ঘকাল পরে জন্মভূমির কোলে ফিরিয়া আসিয়া পর-গৃহে প্রবাসীর মত থাকিতে অন্তর তাহার নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু উপায় নাই! দুঃখ তাহার যত প্রবলতম হউক না কেন, বর্ষার নদীর মত সে মুহুর্মুহু যত ফুলিয়া উঠুক না কেন, সংযমের কঠিন শৃঙ্খলে তাহাকে নিরুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুধু শ্বশুর ব্রজমোহনের মুখপানে চাহিয়া। সন্তানহারা পিতৃবক্ষের সীমাহীন বেদনার কাছে তাহার ব্যথা যে খদ্যোতের মতই ক্ষীণ-দ্যুতি, ম্লান!

স্নান শেষে প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্বশুর-জামাতা আহারের নিমিত্ত অন্দরে আসিলেন।

মর্ম্মরমণ্ডিত সুবৃহৎ কক্ষে রূপার বাসনে পরিপাটী সাজান জামাতার উপযোগী বহু আহার্য্য থরে থরে শোভা পাইতেছিল। ব্যঞ্জনের সুগন্ধে কক্ষের বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুর-জামাতার বসিবার জন্য হস্তরচিত দুইখানি পশমের আসন পাশাপাশি পাতা এবং তাহারই সম্মুখে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী, বালক-বালিকা, অনেকগুলি বসিয়াছিল,—সূর্য্যের উপর পাতলা মেঘের আচ্ছাদনের মত, সকলের মুখেই একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছিল; কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া চাহিলেই বুঝা যাইতেছিল, এই বিষণ্ণতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, একটা দুর্নিবার কৌতূহল।

ব্রজমোহন জামাতার পানে চাহিয়া কহিলেন,—"শৈল, এঁদের তুমি ভাল চেন না, বাবা! ওঁরা তোমার খুড়-শাশুড়ী, মামী-শাশুড়ী, পিস্‌-শাশুড়ী, ওঁদের সব নমস্কার কর।"

শ্বশুরের নির্দ্দেশমত প্রণম্যগণের পায়ের ধূলা শৈল নতমস্তকে গ্রহণ করিল। তাঁহারাও জনে জনে চোখ মুছিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া শৈলকে যথারীতি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রজমোহনের পানে চাহিয়া শৈল কহিল,—"মা?"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! তিনি আছেন; এখন আর তাঁকে ডাকব না! যাবার সময় তাঁকে নমস্কার ক'রে যেও, বাবা! বেলা গেছে, এসো খেতে বসি।"

প্রবাসের পাঁচ কথা গল্প করিতে করিতে শ্বশুর-জামাতার আহার শেষ হইয়া গেল।

বসিবার ঘরে গুড়গুড়ির নলটা মুখে দিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "শৈল, কোথায় প্রাকটিস্‌ করবে? কিছু স্থির কল্লে?"

শৈল বলিল, "এখন ও-বিষয়ে কোন চিন্তা করিনি। দাদারা কি বলেন শুনি?"

—"তা বটে! সবে তো আজ আসছ। তোমার মামা ও' ভায়েদের সঙ্গে তোমার পরামর্শ করা উচিত। তবে আমি বলি,—" ব্রজমোহন থামিলেন।

শ্বশুর কি বলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছায় শৈল ব্রজমোহনের মুখের পানে চাহিতেই তিনি কহিলেন, "পাটনা হাইকোর্টের এস, মিত্তিরের সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। আমি তাঁকে বল্‌লেই তিনি তোমায় জুনিয়ার ক'রে নেবেন। তাঁর প্রসিদ্ধির কথা তুমি বোধ হয় শুনেছ। আর আমার পাটনার বাড়ীখানাও বেশ ভাল, সাজানও আছে।"

শৈল চুপ করিয়া রহিল। যাহার সহিত সমস্ত বন্ধন ভগবান্ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, সেই তাঁহারই কাছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সাহায্যের জন্য হাত পাতিবার ব্যথা, মেঘাবৃত চাঁদের মতই মনের আনন্দটাকে ম্লান করিয়া দেয়।

শৈলর আনত মুখে যে বিষাদের ছায়াটুকু পড়িয়াছিল, ব্রজমোহনের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির কাছে তাহা গোপন রহিল না। নিঃশব্দে জামাতার মুখের পানে চাহিয়া তিনি ধীরে ধীরে শৈলর মনের কথাটা কাড়িয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি তোমায় কোন বিষয়ে জোর করছি না; তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, তাই কর্ত্তব্যবোধে সুবিধাটা শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি। মিঃ মিত্তিরের সাহায্য পেলে কর্ম্ম-জীবনের উন্নতিটা তোমার দ্রুত-গতিতেই হবে।"

শৈল আস্তে আস্তে কহিল, "কিন্তু আমায় একটু ভাবতে হবে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। খপ্ ক'রে কোন কায করা ঠিক নয়। ভাল, তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে এইবার দেখা করতে চল।"

শৈল শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি কহিলেন, "তুমি কে গা, বাছা?"

শ্বশুরের পানে চকিতে চাহিয়া শৈল কহিল, "আমি শৈল।"

"শৈল? শৈল আবার কে? ল্যাবেণ্ডারের বড় ছেলে? সে এর মধ্যে এত বড় হ'লো কি ক'রে? তোমাতে আর সুনীলাতে এক-আঁতুড়ে তো জন্মালে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "আঃ, কাকে কি বলছ? শৈল! আমাদের জামাই শৈল! যে বিলেত গেছল!"

সবিস্ময়ে শৈল দেখিল, শাশুড়ীর উদাস চোখে-মুখে এতক্ষণে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বাস্তবের কঠিন আঘাত স্বপ্নের ইন্দ্রজালকে

ভাঙ্গিয়া দিল। ব্রজমোহন-গৃহিণী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে সুনীলা রে! ওরে সোনার প্রতিমা!"

শিবের জটায় যেন জাহ্নবীর ধারা এত দিন গুপ্ত ছিল। কন্যাহারার প্রচণ্ড শোকটা ব্রজমোহন এত দিন নিজের মাঝে চাপিয়া সহজভাবে চলাফেরা করিতেছিলেন! পত্নীর হাহাকারে সে আর আড়ালে রহিল না। ছিন্নসূত্র মুক্তাদলের মত একরাশ জল তাঁহার দুই চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

শৈলকে লইয়া ব্রজমোহন বাহিরে আসিলেন। রুমালে চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"সে যাবার পর হ'তেই ওঁর—তোমার শাশুড়ীর মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে, বাবা! মানুষ গুলিয়ে ফেলেন, কথা গুলিয়ে ফেলেন!"

৩
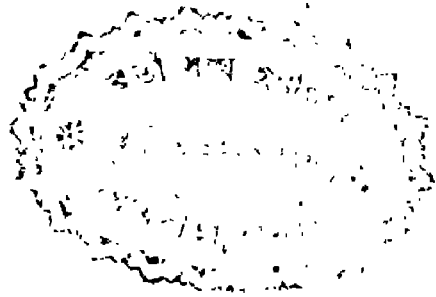
শৈলর মামার বাড়ীতে শৈলকে লইয়া যেন একটা হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। আত্মপর পাঁচ জনে মিলিয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে ঘিরিয়া চক্রব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিলেন। চারি দিকের অজস্র প্রশ্নজালবর্ষণে শৈল একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

মুক্তি দিলেন শৈলর বড় মামার বড় ছেলে অর্থাৎ শৈলর বড়দা। সকলকে ধমকাইয়া তিনি কহিলেন,—"ও তো এখন আছে, পালাচ্ছে না। একে একে তোদের যত কথা আছে, জিজ্ঞেস করিস্। এখন ওকে জিরুতে দে। চল শৈল, ওপরে চল।"

ভায়েরা তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,— "হ্যাঁ রে, বোস মশায়ের কাছ হ'তে তুই টাকা চেয়েছিলি, না নিজেই তিনি দিতেন? আমাদের তো ভারি ভাবনা হ'য়েছিল।"

শৈল হাসিয়া কহিল,—"তা আমি জানতে পেরেছিলুম, যখন চিঠির উত্তর পেলুম না।"

বড়দা কহিলেন,—"কি উত্তর দেব বল? মনে বুঝলুম, টাকা দেওয়া উচিত। বিদেশে বিভূঁয়ে! কিন্তু দিই কোথা থেকে? যা রোজগার করি, পেট চলে কোন মতে। তা বোস মশাইকে কি লিখ্‌লি?"

—"কিছু না। উনি নিজে হ'তেই লিখে পাঠালেন, কোন কিছু ভেব না; যেমন পাচ্ছিলে, তেমনই পাবে।"

ভায়েরা এক সঙ্গে মুখ ফাঁক করিয়া এঁ্যা শব্দ করিয়া উঠিলেন! বড়দা কহিলেন,—"বলিস কি? কল্জের জোর্ আছে বটে! আর নিজের চোখেই তো দেখে এলুম, আজ তোকে যা যত্ন ক'রে নিয়ে গেলেন। আহা, আজ বৌমা বেঁচে থাকলে তোর প্রাক্টিস্টার সুবিধে হ'তো। পাটনার মিত্তির সাহেব শুনেছি ওঁর বিশেষ বন্ধু।"

শৈল ধীরে ধীরে কহিল,—"উনি আমায় পাটনায় প্রাক্টিস্ করবার কথা ব'ল্ছিলেন।"

ভায়েরা লাফাইয়া উঠিলেন। "অতি উত্তম পরামর্শ। উনি যদি তোকে কারু জুনিয়ার ক'রে দেন।"

শৈল কহিল,—"বল্লেন ত, আমার বন্ধু মিত্তির আছে, তাকে ব'লে দেব। আমি কিন্তু কিছু কথা দিইনি।"

শৈলর মেজদা কহিলেন,—"তখনি তোমার রাজি হওয়া উচিত ছিল, শৈল। সুযোগটা জীবনে বার বার আসে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল কহিল,—"কিন্তু এতটা সাহায্য নেওয়া কি আমার পক্ষে ঠিক হবে? পাটনাতেই উনি বাড়ীর অবধি ব্যবস্থা করেছেন।"

মূহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া সেজদা তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—"ঠিক হবে, কেন না হবে শুনি? তিনি যখন মেয়ের বিয়ে দিলেন, তখনই তো ব'লেছিলেন,—'জামাই মানুষ করার ভার আমার'।"

বড়দা কহিলেন,—"মেয়ে থাকলে অবশ্য সে কথা চ'লত! আচ্ছা, শৈল, উনি ত নিজে এখানকার এটর্ণী, তবে তোমায় ঠেলছেন কেন পাটনাতে?

মেজদা কহিলেন,—"সে কথা তিনি বুঝবেন; আমাদের ভাববার কিছু নেই। এখানকার বারের অবস্থা ত তিনি জানেন। নিশ্চয়

বুঝেছেন, পাটনাতেই শৈল সুবিধা করতে পারবে। আর অত বড় মিত্তির সাহেব র'য়েছেন। দাদা, তুমি মেয়ে থাকা-থাকির কথা কি বল্‌ছ? ও কি আর কারু মেয়ে বিয়ে করেছে?" তার পর শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ্‌ শৈল, তুই চট্‌ ক'রে বিয়ে করিস্‌নি। নিজের সুবিধা গুছিয়ে তার পর।"

বড়দা কহিলেন,—"সে নিশ্চয় কথা। কিন্তু ও এখন অন্য বিয়ে না কর্‌লেও তাঁর মেয়ে ত নেই!"

সেজদা কহিলেন,—"নেই! সে তাঁর মন্দ কপাল! শৈল ত তাকে মারেনি? তার অদৃষ্টেই সে ম'রেছে!"

শৈল এতক্ষণ নীরবেই ভায়েদের বাদানুবাদ ও অযাচিত উপদেশগুলি শুনিতেছিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্তর তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সেজদা! মন্দ কপালই যদি হয়, সেই মন্দটা তুমি আমার দিক্‌ থেকে ধরে নাও না। নেবার যেখানে সামান্য অধিকার নেই, সেখানে অনুক্ষণ হার্ত-পাতার কদর্য্যতা যে সব সুখ-শান্তি নষ্ট করে।"

শৈলর কথার ঝাঁঝে ও স্বরের তীক্ষ্ণতায় কক্ষটা যেন রি-রি করিয়া উঠিল। ভায়েরা থামিয়া গেলেন। সে নিজেও একপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া পূর্ব্ব আলোচনাটাকে টানিয়া আনিয়া শৈল কহিল,—"কিন্তু আমি আমার শ্বশুর মশাইকে বলে দিয়ে এসেছি যে, দাদাদের পরামর্শ ছাড়া আমি চ'লতে পারি না। তিনিও ব'লেছেন, ভায়েদের সঙ্গে কথা কও।"

যে অপ্রসন্ন মেঘখানা কয়েক মুহূর্ত্ত কক্ষস্থিত প্রাণীকয়টির উত্তেজনা-দীপ্ত মুখগুলিকে অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শৈলর কথার সুবাতাসে

নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইল—তাহার দাদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বড়দা কহিলেন, "তিনি ঠিকই বলেছেন।"

সেজদা কহিলেন, "দেখ শৈল, তোমার ও-কবিতার উচ্ছ্বাস রাখ; আমি চিরকালই জানি, তুই এক জন মস্ত ভাবুক। কিন্তু এটা মনে রাখিস, খাঁটি সত্যি প্রয়োজন যতক্ষণ আছে, নেবার অধিকার ততক্ষণ আছে; লজ্জা অপ্রয়োজনে নিতে।"

বড়দা কহিলেন,—"কথাটা আমিও মানি, যখন তাঁর দেবার শক্তি আছে, এবং তোমারও নেবার প্রয়োজন আছে, তখন নেওয়াই আমাদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত।"

মেজদা সহসা প্রশ্ন করিলেন,—"শৈল, তোর যে এক শালী ছিল?"

শৈল চমকিত হইল। দপ্ করিয়া মনে পড়িল, শ্বশুর তাহাকে অপরিচিত অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেও নিজের আত্মজার নামটা অবধি তিনি ত কই একটিবারও উল্লেখ করেন নাই। ইহা যেন তাহাকে পরম বিস্ময়ে অভিভূত করিল। তবে মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, দাদারা উত্তরের অপেক্ষায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

একটা ঢোক গিলিয়া শৈল কহিল,—"আছে তো কি?"

শৈলর নিরুত্তর আননের উপর মুহূর্ত্তের জন্য যে অন্যমনস্কতার ছায়া-পাত হইয়াছিল, ভায়েদের দৃষ্টিতে তাহা গোপন না থাকিলেও অর্থটা তাঁহারা অন্য প্রকার করিলেন।

মেজদা কহিলেন,—"না, জিজ্ঞেস করছি, কত বড়টি সে হয়েছে, দেখতে-শুনতে কেমন? বোস মশায়ের তো ওই আর একটি মেয়ে—"

গম্ভীর মুখে শৈল উত্তর দিল,—"না, তাকে দেখিনি।"

বিস্মিত কণ্ঠে সেজদা কহিলেন,—"সে কি রে, সে যে তোর নিজের শালী!"

শৈল কোন কিছু একটা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সেই তীক্ষ্ণতর বিস্ময়-টাকে বড়দা স্বচ্ছ করিয়া দিলেন। মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তা হোক্, উপেন, সে বোধ হয় বড় হয়েছে। বোস মশাই বোধ হয় পছন্দ করেন না, শৈলর সঙ্গে সে মেশামিশি করে। আর এটা স্বাভাবিক। হাজার হোক, আমাদের তো বৌমা এখন নেই।

ভায়েরা কথাটাকে অনুমোদন করিল। এত বড় একটা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরও শৈলর মুখ দিয়া কোন সাড়া বাহির হইল না! পূর্ব্বের মতই সে নীরব রহিল এবং তাহার মুখের উপর হইতে সে বিস্ময়ের ছায়াটা তিরোহিত হইলেও কথায়-বার্ত্তায় পূর্ব্বেকার উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না।

রাত্রিতে আহারের স্থানে বৌদির দল শৈলকে ধরিয়া বসিল, "তোমার পাটনার বাড়ীতে আমরা বেড়াতে যাব, ঠাকুরপো!"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শৈল কহিল, "আমার বাড়ী!"

"না, তোমার বাড়ী নয় তো কি? তুমি যেখানেই বাস করবে, সেইটাই তোমার বাড়ী।"

"আমি যে সেখানে বাস করব, সেটা কি নিশ্চিত হয়ে গেছে?"

বৌদিরা কহিলেন, "নিশ্চিত স্থির হয়নি তো কি? তুমি বিলেতে থাকতে সুনীলা এখানে যে-ক'বার এসেছিল, সেই ক'বারই সে গল্প করেছে! বাবা তার জন্যে পাটনায় বাড়ী কিনেছেন। তুমি এলে সেখানে থাকবে। আহা, বেচারা কত সুখের কল্পনাই আঁকত!"

শৈল আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিশোরীবুকের অপূর্ণ আশা লইয়া যাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, সেই স্বল্প-পরিচিত, কিশোরী-বধূর মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

৪

বিবেক ন্যায়-ধর্ম্মের যত কথাই মনের মাঝে জড় করিয়া রাখুক, অভাবের প্রেরণা মানুষের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে নির্দ্ধারিত কর্ম্মপথে পরিচালিত করে।

প্রায় দুই বৎসর হইল, শৈল পাটনায় আসিয়াছে। মিঃ এস্, এন্, রায় সাহেব বা রয় নামে সে এখন সকলের নিকট পরিচিত। তাহাকে জুনিয়ার না দিলে মিত্র সাহেবের মত কর্ম্মব্যস্ত ব্যারিষ্টার কাহারও ব্রীফ লইয়া মামলা সুবিধামত পরিচালিত করিতে পারেন না, কাযেই শৈলর হাতে এখন অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটিয়াছে এবং বৌদিদির দল অনাহূত-ভাবে আসিয়া বার-দুই তাহার বাড়ীতে হানা দিয়া গিয়াছেন। দাদারাও শৈলর ব্যয়ে মাঝে মাঝে আসিয়া নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া শৈলর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। আসেন নাই শুধু শ্বশুর ব্রজমোহন। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের উপযোগী জলবায়ু খুঁজিতে তিনি পশ্চিমের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাটনার জলবায়ুর উপকারিতা জানা সত্ত্বেও সেখানে তিনি পদার্পণ করেন নাই। জামাতার সাদর-নিমন্ত্রণ তিনি নানা অজুহাতে এড়াইয়া যাইতেন।

সেদিন শ্বশুরের পত্রে শৈল জানিতে পারিল, তিনি সপরিবারে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন এবং কিছু দিন তথায় থাকিবেন। উত্তরে শৈল নিজের কুশল দিয়া, অনেকখানি পীড়াপীড়ি করিয়া পত্রে

অনুরোধ করিল, তিনি ফিরিবার মুখে একবার যেন পাটনা হইয়া যান। মনে মনে শৈল সঙ্কল্প করিল, শ্বশুর যদি এবারও তাহার কথা না রাখেন, তবে সে-ও এই পাটনার বাড়ীতে বাস করাকে ইতি করিয়া দিবে।

পত্র শেষ করিয়া শৈল যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন সম্মুখের সুবৃহৎ ঘড়িটার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। ঘড়ির কাঁটা রাত্রি আটটা ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছে। শৈল চমকিয়া উঠিল! আজ মিত্র সাহেবের ভবনে তাহার যে আহারের নিমন্ত্রণ আছে! একদম এ কথাটা সে যে বিস্মৃত হইয়াছিল!

ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া হাত-মুখ ধৌত করিয়া নিজেকে পরিচ্ছন্ন করিতে সে পাশের গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

মিত্র সাহেবের কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভবনে ভোজের আয়োজন ঘটিয়াছিল। শৈলর স্মরণ হইল, উপহার একটা দেওয়া উচিত। কিন্তু দিবার মত নিজের কাছে কোন জিনিষই সে খুঁজিয়া পাইল না। রবিবার বিলাতী ফার্মগুলি বন্ধ। কিছু যে একটা ত্বরিতে কিনিয়া আনিবে, সে উপায় নাই। দেশীই বা কি দেওয়া যায়? শৈল ভাবিতে লাগিল। একটা বেনারসী! না, সে বড্ড জমকাল হইবে। খদ্দরের ঢাকাই সাড়ী বেশ হইবে। বৌদিদিরা তো পূজার সময়ে তাহাই পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং মানাইয়াছিলও বেশ! শৈল নিজের ক্লার্ককে ডাকিয়া সাড়ীর ফরমাস করিল।

সে কহিল,—"আজ যে হরতাল, কিছু মিল্‌বে না।"

শৈল বিব্রত হইয়া পড়িল। মনে মনে কহিল,—এমন দিনেও মানুষের জন্মদিন হয়? স্ত্রীলোককে উপহার দিবার মত কোন জিনিষই যে তাহার নারী-বর্জ্জিত গৃহস্থালীতে নাই! কি দিয়া আজিকার সম্ভ্রম সে রক্ষা করিবে? নিরুপায় শৈল চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল।

কিন্তু পরিত্রাণ নাই! কল্পনার চোখে সে সুলেখার প্রতীক্ষিত নেত্র দুইটি দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া যেন সুলেখার উৎসুকদৃষ্টিতে ধীরে ধীরে ছায়া ঘনাইয়া আসিল। আনন্দদীপ্ত মুখখানি যেন ম্লান হইয়া পড়িল।

শৈল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, সুবৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন আরম্ভ করিল। হঠাৎ খেয়াল চাপিল, খদ্দরের কাপড়-চাদরে আজ খাঁটি স্বদেশী সাজিয়া সুলেখার জন্মদিনে তাহার কল্যাণ কামনা সে করিবে। শৈলর বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। সুলেখার আজন্মের সংস্কার সংসর্গের প্রভাবের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার এই যে অকপট ইচ্ছা, ইহার মাঝে কি নিজের স্বার্থ জড়িত নাই? সুলেখাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চিন্তা যে অবসরমুহূর্তে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করে, বাহিরে তাহা অপ্রকাশ থাকিলেও শৈল নিজের অন্তরের কাছে ত তাহা অস্বীকার করিতে পারে না!

কল্পনার দৃষ্টিতে মানুষ অনেক কিছু নিরীক্ষণ করে, কিন্তু সহসা তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিলে, বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির ত একটা আকর্ষণ আছে। শৈল নিজের কল্পনার তুলিতে অবসর মুহূর্তে সুলেখার যে রূপটি মানসপটে ফুটাইয়া তুলিত, হঠাৎ যখন সেই অপরূপ মূর্তিতে সুলেখা আসিয়া তাহাকে নত-মাথায় প্রণাম করিল, তখন তাহার ললাটের চন্দন-চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরণের রক্ত বেণারসী, পায়ের আলতা সবগুলির পানেই শৈল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের সুগভীর আনন্দ দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া যেন সুলেখার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

শৈলর সেই অপলক দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজের লজ্জা-রক্তিম মুখ-খানিকে ঘুরাইয়া লইয়া সে কহিল, "এত দেরী ক'রে আপনাকে আস্‌তে হয়? আমরা মনে কচ্ছিলুম, আপনি বুঝি আমাকে আর আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলেন না।"

আশীর্ব্বাদ কথাটায় শৈলর চমক ভাঙ্গিল। উপহার-বিভ্রাট স্মরণ হইয়া হঠাৎ সে একটা কায করিয়া ফেলিল। নিজের মণিবন্ধ হইতে সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটা খুলিয়া সুলেখার দিকে বাড়াইয়া দিল।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সুলেখা কহিল,—"আপনার রিষ্টওয়াচ আমি কি ক'রব!"

হাসিয়া শৈল কহিল—"তোমার হাতে আজকের দিনে পরিয়ে দেব। কেমন, লেখা, নেবে ত?"

আরক্তমুখী সুলেখা নিজের বাম হাতখানি ধীরে ধীরে শৈলর দিকে বাড়াইয়া দিল। ঘড়ী পরিয়া আর এক দফা প্রণাম সারিয়া সে কহিল, "আপনি এখনো কিন্তু আপনার দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ আমায় দেন নি।"

সুলেখার আনন্দদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে শৈল কহিল,—"আচ্ছা দিচ্ছি, শোন। সারা সন্ধ্যেটা ভেবেছি, কি দেওয়া যায়। কিন্তু খুঁজে কিছু পাচ্ছিলুম না। সেই জিনিষটাই আমি খুঁজছিলুম, যে উপহারটা প্রত্যেক বছরের এই দিনটায় তোমার স্মৃতিতে জেগে উঠবে। কিন্তু—"

মিত্র সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলরব করিয়া কহিলেন, "দেখ, শৈল, এবার কি রকম ব্যবস্থা! লেখা প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, বিলিতীর গন্ধটুকুও সইবে না। তাই শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ নয়, বিলিতী খানা-দানার ব্যবস্থা অবধি বন্ধ ক'রেছে! কি যে কাণে ওর তুমি মন্তর দাও, তা তুমিই জান।"

সুলেখা কৃত্রিম অভিমানভরে কহিল,—"বাঃ, উনি কেন মন্তর দেবেন! আমার নিজের যা করা কর্ত্তব্য, তাই করি।"

মিত্র সাহেব হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোর এ কর্ত্তব্য-জ্ঞান এলো কোথা হ'তে, পাগলী! তার গুরু ত শৈল। এখন আমার খালি ভয় হয়, কোন্ দিন না তুমি কোর্ট ক'রে ব'স, বাবা তুমি প্রাক্‌টিস্ ছাড়। এ সব তবু সইছে একরকম—"

শৈল হাসিয়া কহিল, "প্রাক্‌টিস ছাড়া দরকার হ'লে—"

বাধা দিয়া মিত্র সাহেব কহিলেন, "ও সব পাগলামীর কথা তুলো না! ব্যাঙ্কে বেশী এখনও জমেনি, একটা মেয়ে, তবু খরচ আমি সামলে উঠতে পারি না। ছেলেটারও এখন বিলেত থেকে ফেরবার দেরী আছে। শেষে কি একটা—" থামিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা! ব্রজ পাটনায় আসছে না কি?"

শৈল চকিত হইয়া উঠিল। অন্তরের সমস্ত আগ্রহ উজাড় করিয়া সে যাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেই পূজ্যতমের আগমন-সংবাদটা রবিকিরণস্পর্শে শুষ্কপ্রায় শিশিরবিন্দুর মত মনের আনন্দটাকে নিঃশেষে আয়ুহীন করিয়া দিল। অকস্মাৎ আলো নিবাইয়া দিলে কক্ষের চেহারাটা যেমন নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পরিহাস-দীপ্ত মুখের চেহারা ঠিক তেমনই মুহূর্ত্তে বদল হইয়া গেল। গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল,—"আমি ত কিছু জানি না।"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "এইবার জান্‌বে। কাল কি, পরশুর মধ্যেই নিশ্চিত তোমার কাছে টেলিগ্রাম আস্‌বে। ব্রজ আমায় লিখেছে, শৈলর জেদ আমি এড়াতে পাচ্ছি না। শীগ্‌গীর যাব।"

৫
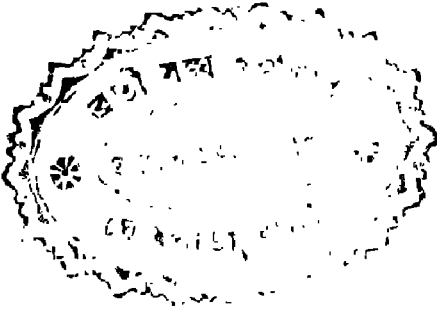
সেদিন মিত্র সাহেবের ভবন হইতে নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিবার পর পুরাপুরি একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শৈল ব্রজমোহনের কাছ হইতে চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই পাইল না। সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

ব্রজমোহনের আগমনের নামে শৈলর অন্তরের এই অবস্থাটার জন্য সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। এটা যে শুধু অনুচিত নহে,—ঘোর অন্যায়, তাহা সে বুঝিতে পারিল। তথাপি অবাধ্য মনটাকে সে কিছুতেই শাসনের শৃঙ্খল পরাইতে পারিল না। চিত্ত যে কেন সহসা ব্রজমোহনের সঙ্গগ্রহণে এতখানি বিমুখ, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে, একটা অব্যক্ত বেদনা তাহাকে আঘাত করিবে, একটা ভয়ানক কুণ্ঠা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচার মত তাহাকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিবে, এমনই একটা বিচিত্র কল্পনা বুকের মাঝে অকারণ একটা ভয়কে ডাকিয়া আনিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যায় শৈল আরাম-চেয়ারটার উপর শুইয়া ছিল। বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সোনালী আলো আসিয়া পড়ার মত একটা প্রসন্নতা তাহার সমস্ত অন্তরটাকে ভরিয়া তুলিয়াছিল! মৃদু বাতাসে কাঁপা শতদলের মত চিত্তটা তাহার পুলক-দোলায় দুলিতেছিল। সম্মুখের খোলা আকাশটার পানে চাহিয়া শৈল সুলেখার কথা ভাবিতেছিল।

সুলেখার পিতার কাছে সে সুলেখার পাণি-প্রার্থনা জানাইয়াছে, মিত্র সাহেবও সানন্দে সম্মতি দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, বৈশাখের প্রথমেই বিবাহটা ঘটিবে। সম্মুখে ফাল্গুন মাস, কিন্তু এ মাসে বিবাহে শৈলর বিশেষ আপত্তি। কারণ, প্রথম বিবাহ তাহার ফাল্গুন মাসেই ঘটিয়াছিল।

সুলেখাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার কিরূপ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে, কল্পনার রঙ্গীন তুলিতে মানস-পটে সেই চিত্র আঁকিতে চিত্ত তাহার আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল।

কিড়িং কিড়িং করিয়া সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ-পিয়নের ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে সজোরে আওয়াজ শোনা গেল,— "জরুরী তার"। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রূপালী ট্রেতে করিয়া নেপালী বয় একখানি লেফাপা আনিয়া শৈলর সম্মুখে ধরিল।

যন্ত্রচালিতের মত একটা সই দিয়া টেলিগ্রাফখানি খুলিয়া শৈল নিঃশব্দে লেখা কয়টার পানে চাহিয়া রহিল। লেখা ছিল, —

"আজ সন্ধ্যায় আমি একা রওনা হইলাম।

ব্রজমোহন।"

শৈলর মাথাটা ভারী হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। দেহটা ঘামে ভিজিয়া উঠিল। যাঁহার অর্থে ও যত্নে শৈল আজ দশ জনের এক জন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, যাঁহার কাছে নিজেকে সারা জীবন ঋণী জ্ঞান করিয়া অন্তর তাহার কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এবং যে পূজ্যতম সুহৃদের নামে সমস্ত মন-প্রাণ তাহার গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে, সেই পরম উপকারক পিতৃপ্রতিম শৈলর একান্ত জেদের নিমন্ত্রণ এড়াইতে না পারিয়াই তাহার কাছে আসিতেছেন জানিয়াও এই জ্যোৎস্নাভরা ফাল্গুন-সন্ধ্যাটার মাঝে ক্ষণপূর্ব্বে সে নিজের

অন্তরে অন্তরে যে আনন্দটুকু উপভোগ করিতেছিল, নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইয়া শীতের কুয়াসাভরা দিনটার মত সমস্ত চিত্ত একটা অসোয়াস্তিতে ভরিয়া উঠিল।

অর্দ্ধেকটা রাত অবধি সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম চিন্তার মধ্যে কাটাইয়া শেষের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম যখন ভাঙ্গিল, চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া দেখিল, ঘড়ীর কাঁটায় আটটা।

শৈল ধড়-মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া মোটর-বাবুকে গাড়ী বাহির করিবার আদেশ দিল।

হাত-মুখ ধোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ত্বরিত-হস্তে চা খাওয়া, কাপড় বদল করা—ছোটখাট কাযগুলা সম্পন্ন করিয়া শৈল বারাণ্ডায় পা দিতেই সম্মুখের বারাণ্ডায় সুলেখাকে দেখিতে পাইল। কপালে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার সারিয়া হাসিমুখে সুলেখা কহিল, "বাবা পাঠিয়ে দিলেন। জ্যাঠামণিকে আনতে আপনি যাবেন! আমাকেও আপনার সঙ্গে যেতে তিনি বলে দিলেন।"

পাংশুমুখে জড়িত-কণ্ঠে শৈল শুধু কহিল, "চলো।"

৬

জামাতার কাছে ব্রজমোহন যে কয়টা দিন কাটাইয়াছিলেন, তাহার মাঝে আদর, যত্ন, সম্মান এবং সেবার কোন ত্রুটিই তিনি দেখিতে পান নাই। বরঞ্চ সময়ে সময়ে, তাহার আতিশয্যে ব্রজমোহন বিব্রত হইয়া পড়িতেন। তথাপি যে প্রকাণ্ড আশা লইয়া তিনি পাটনায় আসিয়াছিলেন, মনের মাঝে যে কামনাটা সংগোপন রাখিয়া জামাতাকে তিনি পুত্র-স্নেহে পোষণ করিতেছিলেন, ব্রজমোহন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া গেল।

জামাতাকে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে অনুযোগ করিবারও তাঁহার কিছু ছিল না। তাঁহার অন্তরের একান্ত বাসনার অতি সামান্য ইঙ্গিত অবধি তিনি কোন দিন জামাতাকে দেন নাই। হায় রে অদৃষ্ট! এ ইঙ্গিত কি কেহ দিতে পারে? ব্রজমোহন শুধু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মৃত্যুর! সেই চরম আসন্নকালে শৈলর কাঁধে তিনি সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্তে দুই চোখ চিরতরে মুদিত করিবেন।

মানুষ যখন বিশেষ করিয়া কোন একটা কিছু প্রার্থনা করে, সেই কাম্যই তখন দূরে সরিয়া যায়। ব্রজমোহনের রক্তের চাপ বাড়িত, মাথা ঘুরিত,—ডাক্তার চিকিৎসা করিত, বায়ুপরিবর্ত্তন ঘটিত, কিন্তু মৃত্যু মঙ্গলময়রূপে দেখা দিত না।

শৈলর পাশে বন্ধু-কন্যা স্থলেখাকে দেখিয়া ব্রজমোহনের বুকের মাঝে একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া দাগ টানিয়া দিলেন,—মিত্র সাহেব নিজে। সহাস্যে তিনি ব্রজমোহনের গোচরীভূত করিলেন,—বৈশাখের প্রথমেই শৈল তাঁহার জামাতা হইবে। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনটা যাহাতে শান্তিময় হয়, এ জন্য বন্ধুসমীপে আশীর্ব্বাদও প্রার্থনা করিলেন।

ব্রজমোহন কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নৈরাশ্যের গভীর পীড়ায় অন্তরটা অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তাহারই চিহ্ন তাঁহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব চকিত হইয়া কহিলেন, "ব্রজর কি অসুখ করেছে?"

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "শরীরটা ভাল যাচ্ছে না? রাত্রেও ভাল ঘুম হয়নি।"

ইহার পরদিন শৈলকে ডাকিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "আমি আজ ক'লকাতায় যাব।"

বিস্মিত চোখে শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "এত শীগ্‌গীর? এখানকার সিজনটা ত এখন বেশ ভাল।"

ব্রজমোহন ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "না বাবা! আমার শরীরটা এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে স্থুট্ কচ্ছে না। আমায় যেতে হবে।"

নিজের শরীরের যে অসুস্থটাকে নির্ব্বিকারে ব্রজমোহন জল-বায়ুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন, শ্বশুরের একান্ত ক্লান্ত মুখ ও নিষ্প্রভ চোখের পানে চাহিয়া জামাতা সেইটাকে অসংশয়ে মানিয়া লইল। তাই থাকিবার অনুরোধ আর তাহার ওষ্ঠে আসিল না। শুধু দুঃখপ্রকাশ করিল।

৭

ব্রজমোহনের ধমনীতে রক্তের চাপ হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। চিকিৎসকরা ভয় পাইলেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। উত্তেজনাকর চিন্তারও নিষেধ হইল।

ব্রজমোহনের পাংশু মুখের উপর একটা অতি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অনিলা পিতার কপালের উপর নিজের কোমল হাতখানি মৃদু বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "বাপি! তোমায় কি এখন ফলের রস দেব?"

"দিবি? তা দে, মা। অনু! তোমার মা কি কচ্ছেন?"

"ঠাকুর-ঘরে পূজা কচ্ছেন।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "ও বেশ নিশ্চিন্ত আছে। আঃ! আমি যদি অমনি পারতুম, তা হলে এত যন্ত্রণা —"

বাধা দিয়া অনিলা কহিল, "বাপি, তুমি বড্ড ছট্‌ফট্ কচ্ছ! ডাক্তার ও-রকম করতে মানা করেছেন।"

কন্যার হাতটা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "তা জানি, মা! কিন্তু তারা ত আমার মনের জ্বালা জানে না।" ব্রজমোহন পাশ ফিরিয়া চোখ মুদিলেন; মুহূর্ত্তে চাহিয়া আবার কহিলেন, "উঃ! কি ভুলটাই করলুম! জীবনে প্রত্যেক পা ভুল করেই ফেলে এসেছি। আজ বাঁচ্‌তে চাইলেই বা বাঁচ্‌তে পাব কেন? আমি যে অনুক্ষণ মরণকে ডেকেছিলুম।"

অনিলা শিহরিয়া উঠিল। পিতার বুকজোড়া দুঃখটাকে সে মন-প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারিত। কিন্তু সেই মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় জনক যে অনুক্ষণ নিজের মৃত্যু-কামনা করিতেন, তাহার সংবাদ কেহ জানিত না। আঠার বছরের তরুণীর পক্ষে যে এরূপ সংবাদ জানাও কঠিন; কাণ ও বুদ্ধির মাঝে তখন যে একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়া থাকে—যাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য। তাই অতীব এই সত্যবাণীটা শুনিয়া তাহার পা হইতে মাথার চুল অবধি যেন বার বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

পিতার চিন্তার ধারাটা অনিলার অগোচর ছিল না। সে চিন্তা যে দুঃসহ, তাহাও সে বুঝিত; কিন্তু সে চিন্তার ধারা এমন চরমে উঠিয়াছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও অনিলার কল্পনায় আসিত না।

তাহারা দুইটি বোন একই সঙ্গে বসন্ত রোগে আক্রান্তা হইয়াছিল। দুরন্ত ব্যাধি তাহার দিদিকে মৃত্যুর রাজ্যে টানিয়া লইল এবং নিজের কিঞ্চিৎ ক্ষুধা উপশম করিয়া ভোজন-দক্ষিণা লইল—অনিলার দক্ষিণ নেত্র। সে নিষ্ঠুর যে এক দিন আসিয়াছিল, এ কথা কোন দিন যাহাতে কেহ বিস্মৃত না হইতে পারে, তাহারই অমোঘ চিহ্ন সে আঁকিয়া রাখিয়াছিল অনিলার সারা দেহে।

একটিকে হারাইয়া এবং অপরটির রূপশ্রীহারা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ব্রজমোহন-গৃহিণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মস্তিষ্ক দুর্ব্বল করিয়া বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন এবং যে দয়াময় দেবতা তাঁহার সংসারের উপর এমন নির্ম্মম অমঙ্গল বর্ষণ করিলেন, তাঁহারই দয়া-উদ্রেকের আরাধনায় ব্রজমোহন-গৃহিণী দিনের অধিকাংশ সময় ঠাকুর-ঘরে কাটাইয়া দিতেন। ভগ্নশ্রী সংসারটার পানে তিনি আর ফিরিয়া চাহিতেন না। লোকে বলিত, পূজোটা শেষে বাতিকে দাঁড়াইল।

ব্রজমোহন নিজে কোন দিন পূজা-জপ করিতেন না, তবে দেবতার অর্চ্চনায় পত্নীকে বাধাও দিতেন না। যদি শোকাহতা নারীর অনর্গল চোখের জলের পূজায় সেই নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত সত্য-সনাতনের চিত্ত চঞ্চল হয়।

পাশ ফিরিয়া ব্রজমোহন ডাকিলেন, "অনি, মা!"

"—কি বাবা" বলিয়া অনিলা মুখ নত করিতেই তিনি কহিলেন, "শৈলকে তুই একখানা চিঠি লেখ মা, আমার মনের সব ইচ্ছা জানিয়ে!"

অনিলা চমকিয়া উঠিল। জনক যদি কহিতেন, অনি, তুই অমুককে খুন করিয়া আয়, মা; তাহা হইলে বোধ করি সে এমন করিয়া ভয় পাইত না। পলকে তাহার মুখখানি ছাইয়ের মত সাদা হইয়া ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কন্যার শোণিতলেশহীন মুখের পানে—কম্পিত ওষ্ঠাধরের পানে চাহিয়া ব্রজমোহন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার ক্লান্ত চোখে-মুখে একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বুঝতে পাচ্ছি, মা, এ কায তোর পক্ষে কতখানি কঠিন!"

ব্রজমোহন থামিলেন, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি নিজেও চেষ্টা ক'রেছিলুম তাকে এ কথা বলবার, কিন্তু প্রত্যেক বারই বেধে গেছে! মনে হ'য়েছে, তার চোখে আমি কশাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ব।"

অনিলা আস্তে আস্তে কহিল, "এত দুঃখ ভোগ করবার দরকার কি, বাবা! বিয়ে কি প্রত্যেক মেয়েকেই ক'রতে হবে? যার রূপ আছে, সুবিধা আছে, সে করুক! কিন্তু যার তা নেই! এত দুঃখ করে তা' পাবার প্রয়োজন কি?"

বিদ্যুৎবিকাশ যেমন চকিতে, অন্ধকারে অদৃশ্য অনেক বস্তুকে এক নিমেষের জন্য টানিয়া বাহির করে, তেমনই অনিলার জীবনের একটা সঙ্কল্প মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজমোহনের চোখে উদ্ভাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাঁহার সারা মুখ নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে তিনি কহিলেন, "সারা জীবনটা ধ'রে তোর বিয়ে দেবার কথাটাই ভাবছি। না দেবার চিন্তাটা ত কোন দিন মনের মধ্যে উদয় হয় নি; তাই যখন ভিতরে সামর্থ্য শেষ হ'য়ে যাচ্ছিল, তখন কোন কথা না ভেবে শৈলর বিলেতের খরচ মাসে মাসে চারশ' করে টাকা জুগিয়ে এসেছি, শুধু এই একটি লোভে! পাটনার বাড়ী তারই জন্যে কিনে রেখেছিলুম— ভবিষ্যতের উন্নতি তার ঐখান হ'তে হবে ব'লে। তা না হ'লে সুনীলা আমার অনেক দিন চলে গেছে! শৈলর পিছনে এত টাকা ঢেলেছিলুম শুধু এই একটি কামনায়! দেনা ক'রে তার মোটর কিনে দিয়েছি, বাড়ী সাজিয়ে দিয়েছি কৃতজ্ঞতার বোঝাটা ভারী ক'রে দেবার জন্যে। যে দিন উপকার চাইব, আমার উপকারের নাগপাশ সে দিন সে খুলতে পারবে না—সম্মতি দেবে।"

কন্যা-স্নেহে পিতা কেমন করিয়া পরের ছেলেকে আপন করিবার জন্য বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী শুনিতে শুনিতে নিজের উপর অনিলার কেমন একটা উৎকট বিতৃষ্ণা জাগিতেছিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল, "বাবা, এমন ক'রে কোন কিছুই চাইতে নেই। এ অসম্ভব চিন্তা তুমি ত্যাগ কর।"

"কেন ছাড়ব, মা? আমি কি সাধ্যের অতিরিক্ত করিনি? অনিলা, তোমার চোখেও কি আমি স্বার্থপর হ'য়ে ফুটে উঠছি? কিন্তু ভেবে দেখ দিকি, এটর্ণীগিরিতে পসার অনেক দিন আমার ফুরিয়েছিল। বাইরের বড়মানুষী ঠাট বজায় রাখতে আমি দেনার

পাকে কি ভয়ানক ভাবে জড়িয়ে পড়লুম, তা ত তোমার অবিদিত নেই! সেই সময়ে ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে তোমাদের মাথা-গোঁজবার স্থান না রেখে আমি তার খরচ বহন ক'রেছি। কেন ক'রেছি? শুধু ঐ একটি আশা মনে করেই ত?"

অনেক কথা এক সঙ্গে কহিয়া ব্রজমোহন হাঁপাইয়া পড়িলেন। কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। অনিলা ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যকে আইসব্যাগ ভরিয়া আনিতে বলিয়া অডিকলোনের পটীটা টেবলের উপর হইতে তুলিয়া লইল।

প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে রোগী যেমন বিকারের রক্ত-আঁখির শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া একবার ঝাঁপাইয়া উঠে এবং পরমুহূর্ত্তে নির্জীব হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়ে, তেমনই করিয়া ব্রজমোহন তাঁহার রক্ত-আঁখি মেলিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। পরমুহূর্ত্তে শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন। পিতার রক্ত-নেত্রের পানে চাহিয়া অনিলা শিহরিয়া উঠিল! ভীত-কণ্ঠে কহিল, "আমি ডাক্তারকে ফোন্ কচ্ছি।"

"কেন আমার ত কোন অসুখ করেনি!" ম্লান দীপ্তিহীন অপরাহ্নের আলোর মত একটা ক্লান্ত-হাসি ব্রজমোহনের ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল! "উঃ—অনিলা, বড্ড গরম!"

অনিলা ত্রস্তে উঠিয়া ফ্যানের রেগুলেটার পূর্ণ-বেগ করিয়া দিল। রক্তের চাপ এখন কতখানি, তাহা জানিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

ভৃত্য আসিয়া বরফের থলিটা অনিলার হাতে দিল, অনিলা তাহাকে কহিল, "শীগ্‌গীর ডাক্তার সাহেবকে ফোন্ কর্ত্তে বল। আর অবনী বাবুকে ডেকে দাও।"

নিদারুণ ভয়ে অনিলার ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করিয়া পিতার মাথায় আইসব্যাগটা চাপিয়া

ধরিতেই তিনি হাত দিয়া অনিলার বাম হাতখানা টানিয়া লইলেন।

পিতার মুখের উপর মুখ নত করিয়া অনিলা কহিল,—"কি চাই, বাবা ?"

মেয়ের বাম হাতখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "এইখানে হাত দে, দেখ্, শৈলকে আমি কত ভালবাসি, সে আমার ছেলে।"

ডান হাতে বরফের থলিটা জনকের মাথায় চাপিয়া ধরিয়া বাম হাতখানি সে পিতার বুকে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সেবারতা কন্যার একান্ত ভীত-পাংশু মুখের পানে ব্রজমোহন একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কহিলেন, "অনিলা, তোমাদের কি দাদা আছে যে, তার হাতে তোমায় আমি দিয়ে যাব ? তোমার মা পাগল, তাকেই বা আমি কার কাছে দিয়ে যাব ! না, আমি যাব না ! ডাক্তার—"

পরিচিত মোটরের হর্ণ রাস্তার দূরে শ্রুত হইল। অনিলা আশান্বিত হইয়া কহিল,—"এই যে তিনি এলেন ব'লে !"

ব্রজমোহনের ইতস্ততঃ দৃষ্টি একবার কক্ষের চারিপাশে ঘুরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "নিজের জন্য অনিলা তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? একবার কল্পনার চোখে আমার মত দেখ, তুমি চ'লে গেছ ; আর সুনীলা—তোমার মতই অঙ্গহীন ; কুৎসিত মূর্ত্তি নিয়ে বেঁচে আছে ! তা হ'লে কি শৈল তাকে ত্যাগ ক'রত, না নিজের মন্দ অদৃষ্ট ব'লে বিনা দ্বিধায় তাকে গ্রহণ ক'রত ?" ব্রজমোহন উত্তেজিত হইয়া সজোরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন,—অনিলার হাত হইতে আইসের ব্যাগটা পড়িয়া গেল। ব্রজমোহনের ললাটের স্ফীত শিরাগুলা ভয়ানক

স্থূল হইয়া উঠিল। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মগজের শিরা, উপশিরা ছিঁড়িয়া দিতে ঊর্দ্ধপথে ছুটিয়া সারা মুখখানিকে আরক্তিম করিয়া তুলিল।

“বাবা কি কচ্ছ—” বলিয়া অনিলা, পিতাকে ধরিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু ব্রজমোহনের সংজ্ঞাহারা দেহটা তাহার পূর্ব্বেই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যু তাহার অশরীরী হাতে ব্রজমোহনের প্রশস্ত ললাটের উপর নিজের গাঢ় কালিমা ছিদ্র-হীন করিয়া লেপিয়া দিতে লাগিল!

দুয়ারের বাহিরে জুতার আওয়াজ হইল। অবনী বাবু দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া ডাক্তার বাবুকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮
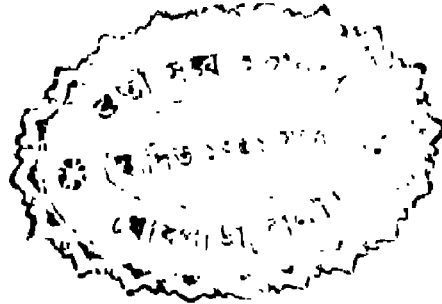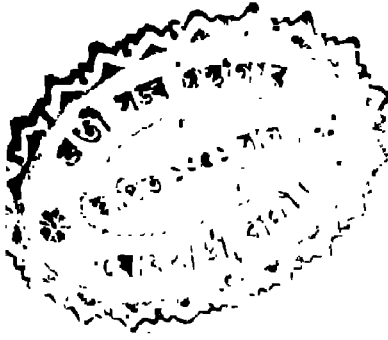
ফাল্গুনের ঈষৎ-উষ্ণ বেলা-শেষে সদ্য-ফোটা ফুলের গন্ধভরা ঝিরঝিরে বাতাস খোলা বারাণ্ডার উপর চেয়ারে উপবিষ্ট দুই জন তরুণ-তরুণীর চোখে-মুখে বুলাইয়া তাহাদের চিত্তে পুলকের শিহরণ দিতেছিল।

ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ তাহার বাক্‌দত্তা পত্নী সুলেখার পানে চাহিয়া কহিল,—"লেখা, দেখ ত, নেক্‌লেসের ডিজাইনটা তোমার পছন্দ হয় কি না? শাড়ীগুলো পছন্দ হ'য়েছে?" বলিয়া নীল মকমলের কেস খুলিয়া একটা মূল্যবান নেক্‌লেস্ তাহার সম্মুখে ধরিল।

অলঙ্কারটার পানে চাহিয়া তরুণী সুলেখার দুই চোখে যেন প্রশংসা উপচাইয়া পড়িল। আনন্দিত কণ্ঠে সে কহিল,—"চমৎকার!"

হাসি-হাসিমুখে সুলেখার মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দুষ্টামীভরা কণ্ঠে শৈল কহিল, "তোমার চেয়ে?"

"ইস্, তা বই কি? আমি কি—" সুলেখার কথাটা সমাপ্ত হইল না। টেলিগ্রাফ-পিওন হাঁকিল—"জরুরী তার!" আলোকিত নির্ম্মল আকাশের গায়ে চলন্ত মেঘের ছায়ারচনার মত ব্যারিষ্টার সাহেবের মুখে অকস্মাৎ একটা উদ্বেগের ছায়াপাত হইল। সই দিয়া টেলিগ্রাম-খানি পড়িতেই হাতটা কাঁপিয়া উহা মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

শৈলর মুখের পানে চাহিয়া সুলেখা ভীত হইয়া কহিল, "দেখি" বলিয়া ভূমি হইতে কাগজখানি তুলিয়া লইয়া পড়িয়া গেল—"বাব সংজ্ঞাহীন। আসন্ন অবস্থা। সত্বর আসুন।

অনিল বোস।"

সুলেখা কহিল,—"নিজের শালী আছে না কি ?"

অস্পষ্টকণ্ঠে শৈল কহিল, "শুনেছি। চোখে দেখিনি !"

সুলেখার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—"আশ্চর্য্য !"

কথাটা কিন্তু শৈলর কাণে গিয়াছে বোধ হইল না। সে সম্মুখের টেবলটার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে সে কাহাকে দেখিতেছিল ? সৌম্য প্রশান্ত প্রৌঢ়ের আননে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার চারিপার্শ্বে চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। অনুপস্থিত শুধু শৈল। পুত্রস্নেহে যে শ্বশুরের শোকতপ্ত বুকখানা জুড়িয়া আছে !

সুলেখা কহিল, "এখন কি তুমি যাবে সেখানে ?"

সুলেখার কণ্ঠস্বরে শৈল যেন সম্বিৎ পাইল। চকিত হইয়া কহিল, "নিশ্চয় ! তাঁর এ রকম অবস্থায় আমার পক্ষে না যাওয়া অসম্ভব, লেখা।" শৈলর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

মৃদুকণ্ঠে সুলেখা কহিল—"আমিও তাই বলি ! তা হ'লে সময় আর কোথা ?

ঘড়ির পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া শৈল কহিল, "আর আধ ঘণ্টা আছে। তার মধ্যে ট্রেণ ধ'রতে পারব, গোছাবার কিছু দরকার নাই। শুধু ব্যাগটা নিয়ে যাব। হ্যাঁ লেখা, এগুলো তাহ'লে তোমার কাছেই থাক। তোমার বাবার কাছে আর বিদায় নেবার সময় হবে না। তুমি আমার অবস্থাটা তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল সুলেখা !"

সুলেখা কহিল, "বাবা যদি জান্‌তে চান তুমি কবে ফির্‌বে ?"

"কবে যে ফিরব, কিছু ত ব'ল্‌তে পাচ্ছি না সু,—ঘটনাচক্র কোথা যে টান্‌ছে—"

সুলেখা শৈলর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "অর্থাৎ ?"

সহজ কণ্ঠে শৈল কহিল, "এর মাঝে জটিলতা কিছু নেই। যদি তাঁর ভালমন্দ কিছু ঘটে !" শৈলর দুই চোখ অশ্রুতে চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল, তাই বলছিলুম। তবে এটা নিশ্চিত, আমি ঠিক আমাদের বিয়ের সময়ের মধ্যে ফিরে আস্‌ব। ভগবান শুভ করেন ত কালই চ'লে আস্‌তে পারি। তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি"—শৈল সুলেখার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিয়া কহিল,—"আমার বিপদ বুঝছ !" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শৈলর মোটর অনেকক্ষণ সুলেখার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তরুণীর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখ হইতে তাহা যেন সরিয়া যায় নাই। কাণের কাছে তখনও যেন শৈলর কথাগুলা বাজিতেছিল। চাপরাশি দুইবার আসিয়া ফিরিয়া গেল। তথাপি সেই নেক্‌লেসের বাক্সটা হাতে লইয়া সুলেখা মূর্ত্তির মত বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের গায়ে পুঞ্জে-পুঞ্জে জড় হওয়া মেঘরাশি নিজেদের হাল্কা করিবার জন্য বৃষ্টি ছড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহারই স্পর্শে সুলেখার হুঁস হইল—শৈলর বাড়ীতে সে একাকী। শৈল অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে এবং আরও জানিতে পারিল যে, নিজের চোখের জলে তাহার বুকের বসনটা সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

৯

স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজমোহন-গৃহিণী সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর পাঁচটা দিনের মধ্যেও তাঁহার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। অবশেষে চিকিৎসকদের বিঁধা-ফোঁড়া অত্যাচারের যত্নে তাঁহার চৈতন্য-হারা দেহের মাঝে যে ক্ষীণ প্রাণবায়ুটুকু জাগিয়া ছিল, সে আর থাকিতে পারিল না,—চিকিৎসকদের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল। ছয় দিনের প্রভাতেই নিঃশঙ্ক হইয়া ডাক্তারের দল গৃহে ফিরিলেন।

পুত্রহীন ব্রজমোহনের শেষ-ক্রিয়া কন্যার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। জননীর অন্তিম কায অনিলাকেই সম্পন্ন করিতে হইল।

কিন্তু সাত দিনের ব্যবধানে যে পিতামাতাকে হারাইল, তাহার মুখের পানে চাহিয়া শৈলর বুকের মাঝটা উপমাহীন কি এক রকম করিতে লাগিল।

অনিলা যদি কাঁদিত, ব্যাকুল হইয়া শোকপ্রকাশ করিত, তাহা হইলে শৈল বোধ করি এতখানি অস্থির হইয়া পড়িত না। এমন করিয়া ভয়ও পাইত না। এমন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত না। কিন্তু এই যে অচল অটল মূর্ত্তিতে, মর্ম্মান্তিক শোক, দুঃখ সব আত্মসাৎ করিয়া, বুকখানার মাঝে চাপিয়া, অগ্নিগর্ভ ভূধরের মত অনিলা বাহিরে শান্ত, স্থির হইয়া রহিল, তাহাতে যেন শৈল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাকে

বিশ্বাস করিতে শৈলর প্রাণ যেন আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল, ভিতরে গুমরিয়া যে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, অতর্কিত বিস্ফোরণের মত কি জানি কোন্ মুহূর্ত্তে সে শতধা হইয়া পড়িবে, বুঝি বা সেই উত্তাপে অনিলার বাঁচিবার আয়ুটা নিঃশেষে শুকাইয়া যাইবে। তথাপি ধৈর্য্যের ঐ প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া শৈলর সমগ্র অন্তর বার বার শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইতেছিল, সম্ভ্রমে মাথা যেন আপনি নত হইয়া আসিতেছিল।

তত্রাচ ইহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়-তাহার মাত্র এই ক'টা দিনের। বিবাহের স্বল্প অবকাশে শৈল কাহারও সহিত বিশেষ পরিচিত হইতে পারে নাই। তাই চোখে তাহাকে দেখিয়া থাকিলেও চিত্ত তাহাকে স্মরণ রাখে নাই। দীর্ঘকাল প্রবাস-বাস শেষ করিয়া যখন সে গৃহে ফিরিল, তখন অনিলা তাহার নিকট অপরিচিতা ; কিন্তু মুমূর্ষু শ্বশুরের পার্শ্বে উপবিষ্টা অনিলার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই শৈলর বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না, ব্রজমোহন কেন এমন করিয়া তাঁহার এই কন্যাটিকে শৈলর অগোচরে রাখিয়াছিলেন ?

সন্তানকে অপরের দৃষ্টিপথে করুণার পাত্রী করিতে পিতৃস্নেহ আহত হয়।

তবু প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দুঃসহ আঘাতে মনোহর প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ হইয়া গেলেও তাহার ভাঙ্গা-চোরা অবশিষ্ট হইতে ধরা পড়ে অতীতের গৌরব-শ্রী। তাহাতে দর্শকের বুকে জাগিয়া উঠে গভীর অনুকম্পা। কারণ, স্নেহ, মায়া, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি মানব-হৃদয়জাত মহৎ বৃত্তিগুলি আপনা হইতে নির্য্যাতিতের উপর আসিয়া পড়ে।

সেই জন্য পোকায়-কাটা ফুলের মত যে রূপলেখা শেষ হইয়াও নিঃশেষ হয় নাই, ত্রিপাদগ্রাসী চাঁদের ন্যায় ম্রিয়মাণ সেই মুখে-চোখে

ছিল, তাহাকে মনে করিয়া অবনীর অন্তরে বোধ করি একটা বেদনার সাড়া দিল। কেন না, ক্ষণ পরে তিনি যখন কথা কহিলেন; তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি বা ক্ষোভ ফুটিয়া উঠিল না। আর্দ্র কণ্ঠে অবনী বলিলেন,—"তার চোখের পাতা ভিজে এলো, বাবাজি! ভারি-গলায় সে বল্লে, 'আমার সব দাবী চিরকাল শৈলর উপর বজায় থাকবে! অবনী, তুমি দেখো'।"
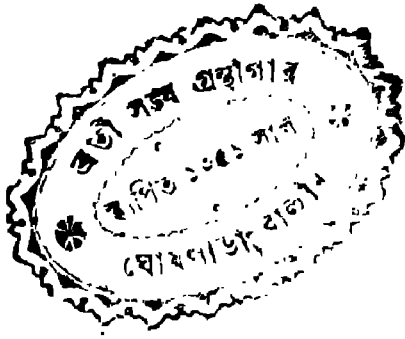
১০

এ কয় দিনের ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়িয়া শৈল সুলেখাকে পত্র লিখিবার অবকাশ অবধি পায় নাই। আজ সুদীর্ঘ জবাব-দিহি করিয়া শৈল যেমন সুলেখার উদ্দেশ্যে পত্রখানি শেষ করিল, তখন অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, ইংলণ্ডে যে দিন তাহার পত্নীবিয়োগ-সংবাদটা সে পাইয়াছিল, সে দিনের অবস্থাটা; এবং সেই স্মৃতিটাই আজ তাহাকে কেমন তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বিঁধিয়া সারা চিত্তটাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

শৈল টেবিলের সম্মুখে চেয়ারটা ছাড়িয়া একটা আরাম-চেয়ারে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সেই বিগত দিনের দুঃসহ স্মৃতিটাকে সে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু স্মৃতির যে পীড়নটা মানুষ সহজে সহিতে চায় না, সময়ে সময়ে দেখা যায়, সেই পরিহার্য্য পীড়নই নাগপাশের মত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সারা অন্তরটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে!

মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া শৈল আত্মীয়দের স্নেহচ্ছায়া ছাড়িয়া জন্মভূমির কোল ত্যাগ করিয়াছিল, যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সকল দুঃখ হরণ করিত, অকস্মাৎ তাহা যখন অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস-সংঘাতে খান্ খান্ হইয়া গেল, প্রবাসের সেই দুঃখের দুর্দ্দিনে, দুর্ভাবনা যখন প্রতি মুহূর্ত্তে দেহের শোণিতবিন্দুকে শোষণ করিতেছিল,

দাবী বা আশার যখন কোথাও কিছু ছিল না, মন্দ অদৃষ্টের সেই চরমতম মুহূর্ত্তে, আচম্বিতে কেমন করিয়া ঝটিকাভরা কাল মেঘখানি তাহার ভাগ্যাকাশ হইতে অপসৃত হইয়া সৌভাগ্যসূর্য্য দীপ্তিশালী হইল? যাঁহার আশ্বাসে, যত্নে ও অর্থে সে মানুষ হইতে পারিয়াছে, আজ সেই নমস্যকে মনে পড়ায় শৈলর চোখে জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষান্তরে যে মাতৃপিতৃহারা সহায়সম্পত্তিহীনা তরুণীটি অবস্থান করিতেছিল, তাহার সঙ্কটময় অবস্থাটা, শৈলর সেই দিনকার বিপদের অপেক্ষা এক তিল কম নহে, বরং পাল্লার ঝুঁকিটা তাহারই দিকে বেশী, শৈলর বুকের মাঝে এ কথাটা অসংশয়ে মীমাংসিত হইয়া গেল।

শৈল মনে মনে সঙ্কল্প করিল, পাটনার বাড়ীটা সে অনিলাকে ফিরাইয়া দিবে এবং মৃত শ্বশুর-শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-খরচটা নিজের কাঁধে তুলিয়া লইবে। এমনই করিয়া অনিলার কি কি উপকারে শৈল তাহার বেদনার ভারটা লঘু করিবে, সেই চিন্তায় সে নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। শৈল যে অকৃতজ্ঞ নহে, তাহাই সপ্রমাণ করিতে উপকারের তালিকাখানা দীর্ঘাকার করিতে অন্তর যখন ব্যস্ত,—মনের এমনিতর অবস্থায়, আকাশে বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একটা তীব্রতম বিবেকের দ্যুতি এক নিমেষে এই গ্রহ-বিড়ম্বিতা মেয়েটির সীমাহীন দুর্ভাগ্যটাকে শৈলর চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে দাঁড় করাইল। এক দিন যাহার রূপ ছিল, অর্থ ছিল, অভিভাবক ছিল, আজ তাহার জীবনে সে সবই জন্মান্তরের কাহিনীর মত গল্পকথা হইয়া গিয়াছে। তাহার বেদনার ভারটা লাঘব করিবার পথ যে কত বড় দুর্গম ও পিচ্ছিল, তাহা মনে হইতেই শৈলর বোধ হইল, পৃথিবীর বাতাস যেন ফরাইয়া তাহার নিশ্বাস গ্রহণের শক্তিটুকু অবধি কাড়িয়া লইতেছে।

এই স্বস্তিশান্তিহীন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শৈল কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের অপর বারাণ্ডাতেই অনিলার কক্ষ। বাহির হইতে তাহাকে দেখা যাইতেছে না। ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া সে কি ভাবিতেছে, শৈল একবার তাহাই ভাবিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর সে অনিলার কক্ষে যাইবার জন্য বারাণ্ডার মোড় ঘুরিল।

খালি মেঝের উপর আনতমুখে অনিলা বসিয়া ছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বিষাদমাখা মুখখানির উপর রুক্ষ খোলা চুল এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল! অর্দ্ধমলিন লালপাড় শাড়ীখানি একটা কঠিন অশৌচকে অনুক্ষণ সকলের চোখে জাগরূক রাখিতে চেষ্টিত হইয়া আছে। শৈলর আগমন-শব্দে চকিত হইয়া একবার মুখ তুলিতেই শৈলর সজল চোখের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইয়া অনিলার চোখে জল আসিল, এবং তাহাই সম্বরণ করিতে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটাইয়া দিল।

শৈল একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল; তথাপি কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। অথচ এই দুঃসহ নীরবতা শৈলর চিত্তে একটা অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু কি যে সে বলিবে, কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তাহার কিছুই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কারণ, মানুষ যখন সন্তপ্ত হৃদয় দিয়া অপরের সীমাহান দুঃখটাকে নিজের বুকে অনুভব করে, তখন সান্ত্বনার স্তোকবাণী ওষ্ঠাধর দিয়া কিছুতেই সে বাহির করিতে পারে না। তাই আর্দ্র নেত্র-দুইটি শৈল যতবারই মুছিয়া ফেলিতেছিল, সে দুইটি নেত্র-পল্লব অশ্রুতে ততবারই সিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে কহিল—"এদিকে আমি সব এক রকম

ক'রে নিতে পারব। শুধু তোমার নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা—" কথাটা শৈল শেষ করিতে পারিল না। একটা দুর্নিবার সঙ্কোচ শৈলর ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল।

অনিলা মুখ তুলিয়া কহিল,—"আমার ব্যবস্থার কথা বলছেন? কিন্তু তার তো কিছুই আপনার হাতের মধ্যে নাই। শুধু বাবার শ্রাদ্ধ—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "সে সব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আর মাস ছয়েকের মধ্যে তোমার এ বাড়ী ছাড়বার কোন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমি ত সব ঠিক জানি না। তোমার মামার বাড়ী —কি আর কোথাও? অবশ্য মাসে, মাসে, একশ ক'রে কি তারও কিছু বেশী টাকা তুমি পাবে। তোমার বাবা সেটুকু সম্পত্তি তোমার জন্যে রেখে গেছেন। পাটনার বাড়ীটাও তোমার আছে, তাতেও একটা মোটা আয় হবে।" শৈল থামিল।

অনিলা যে যথার্থ-ই নিঃস্ব নহে, সঙ্গতি তাহার আছে এবং খুব সামান্য তাহা নহে, এইটুকু যে শৈল অনিলাকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে, মনের এই বিশ্বাসে তাহার চিত্তের কি তৃপ্তি! মেঘমুক্ত আকাশের স্নিগ্ধতার মত সারা মুখখানিকে প্রসন্নতায় ভরাইয়া দিল। অনিলা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় দুইটি ব্যগ্র আঁখির উৎসুক দৃষ্টি অপরের নেত্র হইতে তাহার উপর যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা এই মৌনতাকে বেশীক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে দিল না। অনিলা কহিল, "বাবার অবস্থা আমার কাছে গোপন নেই। তিনি এমন কোন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, যাতে মাসে একশ কি তার কম অতি সামান্য কিছু পেতে পারি। সে শুধু আপনার দয়া! এর জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমায় মাপ করবেন, আমি তা নিতে অক্ষম। পাটনার বাড়ীর কথা বলছেন? বাবা আপনার নাম দিয়ে তা আপনার জন্যে

কিনেছিলেন। দিয়েও গেছেন আপনাকে। আমার নেই বলে বাবার দান-করা জিনিষ ফিরিয়ে নেবার প্রবৃত্তি যেন না জাগে। এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ দুর্ভাগ্য না আসে।”

শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। স্তব্ধ হইয়া সে নিজের আসনে বসিয়া রহিল। অনিলা যে শৈলর সহিত স্বেচ্ছায় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহা শৈল বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু কেন যে ইহা সে করিতেছে, তাহার অর্থই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে প্রসন্নতার আলোটুকু শৈলর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিষণ্ণতার কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর ম্লান মূর্ত্তির মত শৈলর বিষাদমাখা গম্ভীর চেহারার পানে চাহিয়া অনিলার চিত্তটা বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ কল্যাণের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের দুঃখটাকে মানুষ সহিবার শক্তি পায়। অনিলা কহিল,—“আমি কোন আত্মীয়ের আশ্রিত হ’তে পারব না। কারণ, যেখানেই থাকি, আমাদের সমাজে কুমারী থাকার রীতি নেই বলেই তাঁরা অশান্তিতে অস্থির হয়ে যে পথটা নির্দ্দেশ করবেন, সে পথে আমার পক্ষে যাওয়া দুঃসাধ্য। বিবাহ আমি কোন দিনই কাউকে করব না। কোন অনুরোধই আমাকে তা করাতে পারবে না। আপনি কোন মন্দির বা আশ্রমের যদি সংবাদ জানেন, যেখানে পবিত্র কুমারী-জীবন কেটে যাবার পথে কোন বিঘ্ন নেই, আমায় সেই সন্ধান দেবেন। আমি কৃতার্থ হবো।”
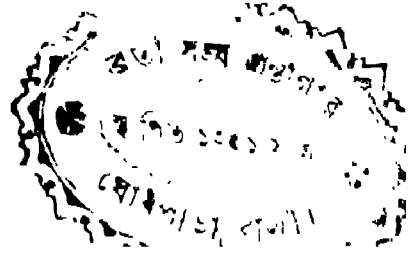
একটা মাস শেষ করিতে এখনও কিছু দিন বাকি, শৈল পাটনা ত্যাগ করিয়াছে। কত বড় কাজের ঝুঁকির মাঝে গিয়া সে পড়িয়াছে, তাহার সেখানে উপস্থিত থাকার এখন কিরূপ বিশেষ প্রয়োজন, তাহার সব খবরই সুলেখা অবগত ছিল। অথচ সুলেখার সহিত মিলিত হইবার জন্য শৈলর অন্তরের নিদারুণ চাঞ্চল্যের কথাও বিদিত ছিল। নিজের বুক দিয়া তাহা এমন নিবিড় ভাবে সে অনুভব করিত যে, শৈলর ব্যাকুলতা যেন সুলেখার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফিরিত। তথাপি একটা অসম্ভাবিত অকল্যাণ, অপ্রত্যাশিত বিষণ্ণতার মেঘ পলকের নিমিত্ত কোথা হইতে ভাসিয়া ভাসিয়া মনের সব আশা-কল্পনার উপর নিরুৎসাহের ম্লানিমা ঢালিয়া দিত—কিন্তু তাহা পলকের জন্য।

শৈলর নির্দ্দোষ চরিত্র, গভীর দায়িত্ববোধ এবং উন্নত মনের উপর সুলেখার যথেষ্ট আস্থা ছিল। শৈল যে শুধু কাযের বেড়াজালে বন্দী! তা ভিন্ন আকর্ষণের কোন বস্তুই সেখানে নাই, তাহা সুলেখা নিশ্চিত জানে এবং শৈলর সঙ্কটময় অবস্থা যত বারই সে চিন্তা করিতে চাহে, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে শৈলর স্বভাবকোমল চিত্তে, পরদুঃখকাতর বুকে, সেই অঙ্গহীনা দুর্ভাগা মেয়েটি কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছে, সেই চিন্তাই সুলেখার বুকে জাগিয়া উঠে। শৈলর সেই নিকটতমা আত্মীয়ার মর্ম্মান্তিক দুঃখে সান্ত্বনা দিতে স্নেহ-প্রবণ অন্তরে কতখানি উচ্ছ্বাস

জাগিয়া উঠে, আগ্রহে বক্ষ স্পন্দিত হয়, তাহার একটা অদ্ভুত কল্পনা সুলেখার মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে।

এই চিন্তার ধারাটা যে শুধু নিজের মনে ব্যথার সৃষ্টি করে, তাহা নহে; শৈলর উপরও একটা অবিচার করে, তাহা সুলেখা বুঝিত! শৈলর সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করা যে নিজের একটা প্রকাণ্ড পাগলামি, তাহা সে বুঝিত। তথাপি এই মোহাবিষ্ট চিন্তার হাত হইতে সুলেখা নিষ্কৃতি পাইত না। অনেক কায মানুষ মনে-প্রাণে অনুচিত বুঝিয়াও করিতে থাকে।

গোধূলির রাঙ্গা আলোর পানে চাহিয়া নিজের এমনিতর চিন্তারাশির মধ্যে সুলেখা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; হাতের বইখানি খসিয়া কখন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই! বাগানের একখানি বেঞ্চির উপর শুধু ক্ষোদিত ভাস্কর-প্রতিমার মতই সে বসিয়াছিল, অকস্মাৎ পরিচিত পদশব্দের সহিত সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনিতে সুলেখা ভয়ানক চমকিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে পশ্চাতের দিকে তাকাইল।

সহাস্যে শৈল কহিল—"কি লেখা, চিন্‌তে পার্‌ছ না?"

শৈলর কৌতুক প্রশ্নে একটা রহস্যময় উত্তর অবধি সুলেখার ওষ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। বিস্ময়-ঘোর কাটাইয়া তখনও সে চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে নাই। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তুমি এমন হঠাৎ—?"

শৈল সুলেখার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—"এমন হঠাৎ আসাটা আমার উচিত হয় নি, না লেখা? কিন্তু আমার অদৃষ্টে দেখছি সবই হঠাৎ হয়। কোনটার চিন্তাই আমি আগে ক'রে উঠতে পারি না।"

সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানকার কায মিটতে এখন তোমার কত দেরি ?"

"খুব বেশী না হলেও এখনও কয়েকটা দিন আছে। ওখানকার একটা হাঙ্গামা আমায় এখানে টেনে এনেছে," বলিয়া শৈল তাহার আগমনের কারণটা যাহা জানাইল, তাহা এই :—একটা দরকারী কাগজ-পত্রের বাক্স পাওয়া যাইতেছে না। অনিলা বলিয়াছে, সেটা তাহার বাবার কাছে বরাবর থাকিত ; কাশী হইতে তিনি পাটনায় যখন যান, তখনও সঙ্গে ছিল। খালি তিনি যখন ফিরিয়া যান, অনিলা তখন সেটা পায় নাই। তাহার অনুমান, সেটা পাটনাতেই আছে এবং সেই সন্ধানেই শৈল এই সুদূর পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘটনাটা বলিয়া শৈল কহিল— "লেখা, তুমিও আমার সঙ্গে চল ! আমি একা খুঁজতে পারি না।"

সুলেখা একটু ইতস্ততঃ করিতেই শৈল তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, কহিল,—"না মশাই, ওজর কিছু চলছে না ! চলুন আমার সঙ্গে।"

গাড়ীতে বসিয়া কথা-প্রসঙ্গে সুলেখা কহিল,—"অনিলার কি ব্যবস্থা কচ্ছ ?"

"অনিলার সম্বন্ধে আমি কিছু ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।" শৈলর দৃষ্টিতে একটা চিন্তার ছায়াপাত হইল। কহিল—"তুমিই বল না লেখা —পরামর্শ দাও কি করি।"

"আমি পরামর্শ দেব ?" সুলেখার প্রবাল-রাঙ্গা ওষ্ঠাধরে হাসি ঘিরিয়া ধরিল। মাথায় একটা দুষ্টামির বুদ্ধি আসিল। কহিল, "তা দিচ্ছি—এক কায কর, তুমি তাকে বিয়ে করে ফেল ! তা হ'লে সব ভাবনা-চিন্তার হাত হ'তে মুক্তি পাবে।"

শৈলর বুকের মাঝখানটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে হাসি-মুখে কহিল, "ধন্যবাদ ! তুমি যে আমার অকৃত্রিম হিতৈষী, তা

বধূনির্ব্বাচনে নিঃসন্দেহ হলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনিলার কঠোর প্রতিজ্ঞা, সে চিরকুমারী থাকবে।"

সুলেখার পরিহাস-দীপ্ত মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। অনিলার কথা বলিতে বলিতে শৈলর গলা অনেকবারই ভার হইয়া আসিয়াছিল, মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়াছিল। তাহা শৈল না জানিতে পারিলেও সুলেখার চোখে অজ্ঞাত ছিল না। নারীহৃদয়ের ঈর্ষ্যা অভিমান জাগিয়া আপনা হইতেই অনিলার উপর তাহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা আনিতেছিল। সুলেখার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সে রাজি নয়? কিন্তু তোমার দিক্ হ'তে—তুমি তাকে"—সুলেখা কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া শৈল ক্ষণকাল সুলেখার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সহসা প্রসন্ন-স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমি কি পারি আর কি পারি, না, তুমিই ব'লে দাও, সু?"

মানুষ যখন যথার্থ-ই অকপট-চিত্তে অপরের কাছ হইতে নিজের কর্ত্তব্যটাকে নির্দ্ধারিত করিবার জন্য আবেদন করে, তখন হৃদয় বলিয়া যাহার বালাই আছে, সে কিছুতেই সেই আবেদনকারীকে পথিভ্রষ্ট হইতে দিতে চাহে না। বিশেষতঃ নারী! প্রিয়জনের ভালবাসার এতটুকু শিথিলতার ভয়ে সে যত বেশী চঞ্চল হয়, আবার তেমনই ধীর শান্ত মূর্ত্তিতে সেই একান্ত আপনার জনকে পরের হাতে সঁপিয়া দিবার উদাহরণও সংসারে বিরল হইলেও দুর্ল্লভ নহে।

হঠাৎ যেন সুলেখার জ্ঞানলাভ হইল। ঈর্ষ্যা, অভিমান চোখের উপর যে সন্দেহের পর্দ্দাখানা দুলাইতেছিল, শৈলর চোখের প্রতি চাহিতেই নিমেষে তাহা অপসৃত হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল, শৈলর বুকের মাঝে মেয়েটির জন্য নির্ম্মল স্নেহের ধারা বহিতেছে,

তাহার সমস্ত বেদনাটুকু সে নিজের বুক দিয়া উপলব্ধি করে বলিয়াই অনিলার কথায় শৈলর চোখে জল আসে। কিন্তু তাহার মাঝে পঙ্কিলতা নাই। নিষ্পাপ-হৃদয়ের স্বার্থলেশহীন যে সৌহার্দ্য, তাহা দিয়াই সে নিকটতমা আত্মীয়াকে স্নেহ করে। তাই সুলেখার সম্মুখে অনিলার নামে শৈল এত নিঃসঙ্কোচ। গোপন করিবার তাহার কিছু নাই বলিয়াই রহস্যে শৈল লজ্জিত হয় না!

শৈল কহিল, "লেখা, কি ভাবছ?"

—"না—কিচ্ছু না। বাক্সটা খুঁজতে হ'লে যে ঘরে জ্যাঠামশাই শুতেন, সেই ঘরটা আগে দেখা উচিত।"

—"ঠিক বলেছ। আমার শোবার ঘরটাই তাঁর জন্য ব্যবস্থা করেছিলুম।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈল বেহারাকে ডাকিল, কহিল,—"হিঁয় একঠো লাল চাম্‌ড়েকা বাকস্ তোম্ দেখা হায়?"

"হাঁ জী! বোস্ সাবকো চলা যানেকা পিছে মেজ পর রহা। হাম্ উঠায়কে দেরাজকা অন্দরমে রাখা।"

শৈল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—"উল্লুক, কাহে নেহি হাম্‌কো কহা?"

বেহারা নত মস্তকে জানাইল, তাহার কসুর হইয়াছে। কিন্তু তাহার অপরাধ স্বীকার সত্ত্বেও দণ্ড হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সুলেখা শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "ও স্বমুখে দোষ স্বীকার কচ্ছে—ক্ষমা চাইছে।" আনন্দ আজ সুলেখার অন্তরের কাণায় কাণায় ভরিয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। কাহারও কুণ্ঠিত মুখ, ম্লান দৃষ্টি, সে দেখিতে চাহে না।

শৈল সুলেখার প্রফুল্ল মুখখানার পানে চাহিয়া কহিল, "হাকিম যখন দয়া করছেন, আমি আর কি বলতে পারি।" সুলেখার হাসির ছোঁয়াচ শৈলর মুখে লাগিয়াছিল। কিন্তু সংসারে যত কিছু ক্ষণস্থায়ী বস্তু আছে,

তাহাদের সকলের অপেক্ষাও আনন্দ ক্ষণস্থায়ী! বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়া তাসের ঘরের মত, চোখের পলকে কোন্ মুহূর্ত্তে ইহা টুটিয়া যাইবে বলা যায় না।

মনিবের আদেশে বেহারা বাক্সটা হাজির করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বস্তু সে প্রদান করিল—তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অচিন্তনীয়। সেটা একখানা ছোট খাতা! মোরক্কো চামড়ায় বাঁধা পুস্তকেরই মত। বেহারা জানাইল, বাক্সর উপর এই কেতাবখানিও সে পাইয়াছিল।

শৈল সেখানা খুলিয়াই দেখিল, শ্বশুরের হস্তাক্ষর—দিনলিপি। কৌতূহলী চিত্তে সে পাতাগুলা একবার উল্টাইয়া দিয়া দেখিল, পাটনা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রি অবধি তাহার উপর শ্বশুর আপনার মনের কথা অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহারই খাপছাড়া কয়েকটি ছত্রের উপর দৃষ্টি-পাতের সঙ্গে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঔৎসুক্যে দুই চোখের দৃষ্টি যেন তাহাতে আঁটিয়া গেল।

পাশে দাঁড়াইয়া সুলেখাও খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তরুণী-বুকের দুর্নিবার কৌতূহলকে কিছুতেই সে দমন করিতে পারিতে-ছিল না। কিন্তু কেহই কল্পনা করিতে পারিল না, মাত্র গোটাকতক লাইনের কতকগুলা সমষ্টি একজনকার অন্তরের অন্তস্তলের বাক্য হইয়া তাহাদের জীবনের নূতন অধ্যায় সূচিত করিবে।

শৈল ও সুলেখা তখন স্থির চোখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতেছিল—

“অনেকখানি আশা লইয়া যাকে মানুষ করেছিলুম, যার উপর প্রচণ্ড লোভ আমার প্রতি শিরায় শিরায় জড়িয়ে আছে, সে আমার হবে না —সত্যর হবে। তার মেয়ের রূপ আছে, গুণ আছে, সত্যর নিজের হাতে অর্থ আছে। শৈলকে পাঁচ জনের সামনে আজ উঁচু হয়ে দাঁড়াতে

হ'লে সত্যর সাহায্য চাই; অনিলার আমার কি আছে? ভগবান্! ভগবান্! তুমি তার অনিন্দিত রূপটুকু যে দিন কেড়ে নিলে, সে দিন সুনীলার মত তোমার চরণপ্রান্তে তাকে ডেকে নিলে না কেন? বাপ-মার কাতর প্রার্থনায় কেন সে দিন রেখে গেলে নির্দ্দয়! উঃ! আর যে পারছি না।

"না! না! কালই চলে যাব। কি জানি, শৈলকে যদি কিছু ব'লে ফেলি। আমার নিজের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি। একি! মাথাটায় যে ভারী যন্ত্রণা হচ্ছে—এত দিন মৃত্যুকে ডাকতুম। মরণকালে শৈলর হাতে অনিলাকে সঁপে দেব বলে। আজ কিন্তু মৃত্যুকে আর চাই না। তার আগমনের নামে ভয় হচ্ছে! আমি চলে গেলে অনিলাকে কার কাছে দিয়ে যাব? তার মা পাগল! তার কি—"

লেখা শেষ হয় নাই। শেষ হইতে পায় নাই। আকস্মিক উত্তেজনায় মানুষ ভাবাবেগে হৃদয়ের যে গভীর দুঃখ, ভীষণ নৈরাশ্য লেখনীর সাহায্যে কাগজের বুকে ঢালিয়া দেয়, এ যেন তাহারই একটা অংশ। এক জনের বুকের মণিকোঠায় আশাভঙ্গের পুঞ্জিত আঘাত স্তূপাকারে জমিয়া উঠিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ তাহাই দুই জন নর-নারীর মাঝখানে নিমেষে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল। শৈল ও সুলেখা একই সঙ্গে মুখ তুলিল, চাহিল, কিন্তু মনে হইল, উভয়ের কাছ হইতে উভয়ে যেন বহুদূরে এক মুহূর্ত্তে সরিয়া গিয়াছে।

সুলেখা আস্তে আস্তে কহিল, "আপনি অনিলার কাছে কবে যাচ্ছেন?"

'তুমি'র আসন আজ 'আপনি' দখল করিয়া বসিল। শৈলর কাণে কিন্তু তাহা বাজিল না। মুখ নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "কাল সকালে।"

—"তবে আমি চল্লুম," বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া শৈলকে একটা ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া সুলেখা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। স্তব্ধ, অসাড় শৈল কক্ষের মধ্যে ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জ্ঞানে, যাহার হাত ধরিয়া সাগ্রহে সে আপনার মোটরে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই একান্ত বাঞ্ছিতার বিদায়-মুহূর্ত্তে শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিবার কথাটা অবধি স্মরণে আসিল না। অপরিসীম ব্যথা-ভরা একটা আকাশ-পাতালজোড়া চিন্তা শৈলর সকল কর্ম্ম হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শৈলকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল!

১২

মামলায় সর্ব্বস্ব হারিলে, মানুষের যেমন শুধু চোখে-মুখে নহে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, এমন কি, কণ্ঠের স্বর অবধি অত্যাশ্চর্য্য বদল হইয়া যায়, সকালের মানুষকে বিকালে যেমন দশ বছর বয়স ডিঙ্গাইয়া দেয়, তেমনই ভাবে সর্ব্বস্বহারার কাল ছাপ শুধু মুখে-চোখে নহে, প্রতি গতি-ভঙ্গীতে অবধি আঁকিয়া শৈল শ্বশুর-ভবনে প্রবেশ করিল।

ব্রজমোহনের শোকাহতা কন্যা ও আশ্রিত অনুগতদের সান্ত্বনা দিয়া সাহায্য করিয়া আসন্ন শ্রাদ্ধক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করাইতে যে আত্মীয়-বন্ধুরা ব্রজমোহনের সুবৃহৎ প্রাসাদ মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রজমোহনের অবস্থার মন্দ দিকটা জানিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দশা যে চরমে দাঁড়াইয়াছে, সেই সংবাদটা তাঁহারা জানিতেন না। তাহা জানিবার অবকাশ কেহ কোন দিন ব্রজমোহনের নিকট পান নাই। কারণ, তীব্র মাদকের নেশার মত, বড়মানুষী নেশাটা মানুষ সহজে ছাড়িতে পারে না। সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনে, যাঁতাকলের মত ইহার পেষণে মানুষ গুঁড়া হইয়া যায়, তথাপি মিথ্যা ঐশ্বর্য্যের মোহ মানুষ ছাড়িতে পারে না।

ব্রজমোহনের সুবৃহৎ বৈঠকখানা ভরিয়া আত্ম-পর অনেকে মিলিয়া তাঁহারই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিল। বাগ্-বিতণ্ডা উদ্দামবেগে বহিতেছিল এবং সে তর্ক-সংগ্রামে বাহুযুদ্ধের আশু সম্ভাবনা যখন রহিয়া

রহিয়া জাগিয়া-উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে শৈল আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড কোলাহল মুহূর্ত্তে নীরব হইল। একটা ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে অপর একটা ইন্দ্রিয়ের প্রখরতার পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়, এখানেও তাহার অভাব ঘটিল না। রুদ্ধবাক্ জনমণ্ডলীর দৃষ্টিশক্তি অকস্মাৎ প্রখর হইয়া শৈলর উপর পতিত হইল। একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টির আঘাতে শৈল কেমন বিব্রত হইয়া একবার নিজের পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া দেখিল, সেখানে কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে কি না।

ক্ষণিকের নীরবতা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। শৈলর সম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠশ্বশুর বিরজামোহন কহিলেন,—"বাবাজীর ট্রেণে বুঝি বড্ড কষ্ট হয়েছিল? মুখ-চোখ কালিমাখা।"

শৈল চমকিয়া উঠিল। চিত্তের বেদনা কি মুখে ছায়া ফেলিয়াছে! একসঙ্গে সকলকে একটা অভিবাদন দিয়া শৈল ভিতরের অভিমুখে যাইতেছিল, বিরজামোহনের পুত্র সন্তোষ হাঁকিয়া কহিল,—"ব্যারিষ্টার সাহেব, এদিক্‌টা শেষ ক'রে যাও।"

শৈল ফিরিয়া আসিল। এ সভায় বসিতে তাহার অন্তর অনিচ্ছুক হইলেও, এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিতে সে পারিল না।

সন্তোষ কহিল, "কাকামণির শ্রাদ্ধের ফর্দ্দখানার একটা মীমাংসা কর। দাঁড়িয়ে হবে না, ব'স।"

একটা চেয়ার টানিয়া শৈল বসিল।

ব্রজমোহনের এই বিপত্নীক জামাতার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবার গোপন ইচ্ছা অনেকের মনেই ওতপ্রোত হইয়া জাগিত, মিলিত না শুধু সুযোগ। আজ হঠাৎ যখন সেই মুহূর্ত্তটা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত এই যশ-অর্থের খ্যাতিসম্পন্ন বিপত্নীকের

মনস্তুষ্টির আশায় সপুত্র বিরজামোহন হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে যে কথাটা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আসল বক্তব্যটা ঢাকা পড়িয়া শুধু একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিল। অবশেষে বিরজামোহন সকলকে থামাইয়া নিজেই মুখপাত্র হইলেন। বলিলেন যে, ব্রজর সহিত তাঁহার সম্বন্ধটা জ্ঞাতিসংক্রান্ত হইলেও ভালবাসাটা একেবারে সহোদরের মত।

বিরজামোহন কহিলেন, "ব্রজ তোমাকে ছেলের চোখেই দেখত, বাবা শৈল। এখন এই বৃহৎ কাযের ভারটা তোমার উপরেই পড়ছে, বাবা।"

শৈল একবার কক্ষস্থিত সকলের পানে চাহিয়া দেখিল। কহিল, "আমি ত উপস্থিত রয়েছি,—আশা করি, আপনারাও আমায় সাহায্য করবেন।"

একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়। নিশ্চয়। এজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। বিরজামোহন কহিলেন,—"সাহায্য করতে আমরা বাধ্য। তুমি কি আমাদের পর ?"

সাহায্য করিতে সকলে বাধ্য হইলেও, সুবিধা তাহাতে কতটুকু হইবে, ইহা বুঝিতেছিল শৈলর অন্তর্য্যামী! তাই সে কাহারও 'পর নহে' এই সুসংবাদটা জানিয়া এবং এতগুলা মুখের আশ্বাসবাণী পাইয়াও তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল না।

ব্রজমোহনের অপর এক আত্মীয় কহিলেন, "অবনী বাবুকে ডাকা হয়েছিল। ব্রজদার সব টাকা-কড়ি তার হাতেই ত থাকত। আয়োজনটা কি রকম হবে, সে না এলে কিছু হ'তে পারে না, এই আমার মত।"

তিনি তাঁহার মতটা উঁচু-গলায় ঘোষণা করিলেও সমর্থনে সেটা স্থায়ী হইল না। প্রতিবাদের স্বরে বিরজামোহন কহিলেন,—"তুমি জিনিষের তলা দেখতে পাও না। শুধু বাজে বক। ইদানীং ব্রজর অবস্থাটা ভাল যাচ্ছিল না, তার খবর কিছু জান? শুধু ত প্রতি বছরের দুর্গাপূজায় এসে জড় হও। সপরিবারে এস, তিন দিন ধরে পেট-পূরে চলে যাও। কিন্তু এই যে এতখানি হয় কোথা থেকে, সে ত আমি জানি।"

বিচালিস্তূপে অগ্নিনিক্ষেপের মত রমণীমোহনের ক্রোধটা দপ করিয়া পলকে জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি অনেকক্ষণ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিলেন! আজিকার সভা আরম্ভ হইতে বিরজামোহন যেমন সাড়ম্বরে নিজের প্রভুত্বটা ঘোষণা করিতেছিলেন, তেমনই প্রতি কথায় অপরকে তুচ্ছ করিতে ছাড়িতেছিলেন না। মানুষ মুখ বুজিয়া অপরের প্রভুত্বটা কোন মতে সহিলেও নিজের প্রতি তাচ্ছিল্যটা কিছুতেই সে সহিতে পারে না। অপমানিত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া পড়ে।

রমণীমোহন তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"তিন দিন আসি আর তের দিন আসি, উপযাচক হ'য়ে কোন দিন আসিনি। ব্রজদা নেমন্তন্ন করতেন, না এলে বৌদিদি দুঃখ করতেন, বলতেন, তোমরা না হ'লে বাড়ী খাঁ খাঁ করে, তাই আসতুম। মাসের গোড়ায় দেখা দিয়ে হাত-পাতবার ত দরকার হতো না?"

কি কথায় কি কথা সব আসিতেছে দেখিয়া শৈল নিজেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিল, সীমাহীন অস্বস্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু যাহাদের কথা, তাহাদের মুখ লজ্জায় ঈষৎ কালও হইল না।

বিরজামোহন উগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"ভায়ের কাছে ভাই একবার ছেড়ে মাসে দশবার এলেও লজ্জা নেই। তবে সে জোর থাকা চাই।

আজ সে নেই, অনিলা মা একা, আমাকে গাড়ী-পাল্কী পাঠাতে হলো না, কাকমুখে শুনে হাজির হলুম, একা নয়, পরিবার ছেলেমেয়ে সব নিয়ে। কিন্তু লোকে মেয়ের বিয়ের সুবিধার জন্য ধর্ণা দিতে পারে, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন-পত্রের দিকে চেয়ে থাকে।"

স্বার্থের বিরোধ, লজ্জাহীন কলহের কদর্য্য মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া কক্ষস্থিত সকলের প্রতি শৈলর চিত্ত ভয়ানক বিমুখ হইয়া পড়িল।

ঘৃণা যখন অন্তরের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, তখন মুখে-চোখেও তাহা গোপন থাকে না। শৈলর মুখের পানে চাহিয়াই সন্তোষ কহিল, "আপনারা তা হ'লে হার-জিত করুন। শৈল বাবু চল্লেন।"

উপদ্রবরত অপদেবতাকে মন্ত্রের জোরে একান্ত বাধ্য করার মত সন্তোষের মুখের বাণীটা দুইটি উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত বয়োবৃদ্ধকে মুহূর্ত্তে শান্ত করিল এবং পলকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানটা সজাগ হইয়া উঠিল। বিরজামোহন আসল কথায় ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন—"তা খরচটা আমাদের একটু চেপে করতে হবে! কি বল, রমণী! হাজার চার-পাঁচ টাকার কমে কি—" বলিয়া তিনি শৈলর মুখের পানে চাহিলেন। বাবাজীর চোখের কোণে কিন্তু সমর্থনের কোন ইঙ্গিতই ফুটিল না।

মনের যত জ্বালা থাকুক, শৈলর সহিত আত্মীয়তা করিবার এই মহেন্দ্র ক্ষণ রমণীমোহন কিছুতেই ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিলেন না। মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। ব্রজদা আমাদের সহোদরের বাড়া, আমরা কি যা-তা করতে পারি ?"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তাই এত মাথা-কুটাকুটি। বলি, হাতীর শ্রাদ্ধ কি মশার কীর্ত্তনে হ'তে পারে ? ব্রজ ছিল একটা দিক্‌পাল! কি বল, বাবাজী ?"

বাবাজী কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইল।

শৈল আস্তে আস্তে কহিল,—"তাঁর কায, তাঁর উপযুক্তই হবে।"

রমণীমোহন কহিলেন, "আমরাও সে কথা মানি। তবে অবনী বাবু কেন গা-ঢাকা দিচ্ছেন? সে না হ'লে কিছু হ'তে পারে না।"

সন্তোষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, কহিল,—"আমাদের কাকামণির শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা করবেন অবনী বাবু এসে! আমরা থাক্‌তে এ হ'তেই পারে না। অনিলাকে জানিয়ে, তার মত নিয়ে ব্যাঙ্ক হ'তে টাকা তোলবার দরখাস্ত করা হোক্।"

একে একে সকলেই এই পরামর্শটাকে সমীচীন জ্ঞান করিলেন। প্রস্তাবটাকে সমর্থন করিয়া বিরজামোহন বলিলেন, "এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কিছু থাকতে পারে না। আর বাবাজী যখন উপস্থিত রয়েছেন, তখন টাকা তোলবার আপত্তি কি থাকতে পারে? অবশ্য শৈল জামাই, তাতে সাহেব, সে এ-সব ঝক্কি পোয়াতে পারবে না। কাযটা আমাদেরই সব করতে হবে।"

এমন অনেক মন্তব্যে কক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। নীরব রহিল শুধু এক জন, এবং তাহার এই নীরবতার আড়ালে যে অর্থটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা দেখিবার দৃষ্টি, বুদ্ধি বা চিত্তের অবস্থা কক্ষস্থিত কোন ব্যক্তিরই ছিল না। সকলেই কর্ত্তা, উপদেষ্টা হইয়া একটা সমস্যাকে সমাধান করিতে—একটা মীমাংসা লইয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। গলার জোর, আত্মীয়তার দাবী, হার-জিতের একটা হট্টগোল বাধাইয়া নিজ নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়া শৈলকে তাক্ লাগাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর।

শৈল হিন্দুর ঘরের সন্তান। তথাপি এরূপ কাণ্ড তাহার জীবনে অ-দৃষ্ট ছিল। শৈশবে পিতা, ও নাবালক অবস্থায় মাতার কাল

হইয়াছিল বলিয়া পূজ্যতমদের পারলৌকিক ক্রিয়াটা তাহাকে সংক্ষেপে চুকাইতে হইয়াছিল। তাই এই রাজস্থয় অনুষ্ঠানের জন্য যে শ্রেষ্ঠ রথিবৃন্দ মাথা ঘামাইয়া কহিতেছিলেন—দান-সাগর, অধ্যাপক-বিদায় ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তাহারই বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখের পানেই চাহিয়া বক্তব্যগুলি শুনিতেছিল। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরের ক্লান্তিটা ধীরে ধীরে তাহার বসিবার শক্তিটাকে কাড়িয়া লইতেছিল। প্রশস্ত ললাটের উপর স্থূল মুক্তাবলীর মত স্বেদবিন্দুগুলি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার বিশ্রামের প্রয়োজনটা অপরকে বুঝাইতেছিল। কিন্তু তাহা দেখিবার মত চোখ সেখানে একটি প্রাণীরও ছিল না।

সম্মুখের বারাণ্ডা দিয়া এক জন ভৃত্যকে যাইতে দেখিয়া শৈল তাহাকে ডাকিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনিতে আদেশ করিল। ক্ষণ-পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিল শুধু হাতে। কহিল,—"দিদিমণি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে জল খেতে ভিতরে ডাকছেন।"

১৩

অনেকের বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া, কৌতুক দৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলিয়া শৈল অন্তঃপুরে আসিয়াছিল। কিন্তু অনিলার কক্ষে আসিয়া সে নিজেই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

একটা জানালা ধরিয়া সম্মুখের বাগানটার দিকে মুখ করিয়া অনিলা দাঁড়াইয়াছিল। বোধ করি, শৈলর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া শৈলকে দেখিয়া কহিল,—"আপনি অনেক-ক্ষণ এসেছেন, আমি খবর পেয়েছি।" একটু থামিয়া কহিল, "আমি অপেক্ষা করছিলুম, আপনি ভেতরে এসে জল খাবেন বলে। বুঝলুম, সে সুবিধা আপনাকে কেউ দেবে না। তাই ডেকে পাঠাতে হ'ল।"

নিজ হাতে আসন পাতিয়া, ফল-মিষ্টান্নের সুবৃহৎ রেকাবীখানি তাহার সম্মুখে দিয়া অনিলা কহিল,—আপনি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসুন; তার পর কাপড় বদলাতে যাবেন।"

শৈল অনিলার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না। তাহার এই অসঙ্কোচ আচরণের মাঝেও নিজেকে যেন কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতে-ছিল। ব্রজমোহনের সেই অসমাপ্ত লেখা বইখানি তখন তাহার জামার বুক-পকেটের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। কত বড় দায়িত্ব মাথায় লইয়া আজ সে এ-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মনে করিলে শৈলর ধমনীতে রক্তস্রোতঃ যেন বন্ধ হইয়া যায়। তথাপি অনিলার

এই নিঃসঙ্কোচ আচরণ, গাম্ভীর্য্যের গভীরতা, তাহার মনের মূল অবধি নাড়িয়া অনিলার প্রতি চিত্তের একটা শ্রদ্ধাকে জাগাইতেছিল।

বিনা-বাক্যে শিষ্ট ছাত্রের মত হাত-মুখ ধুইয়া শৈল আসনে বসিয়া পড়িল এবং নিজের সঙ্কোচটাকে বোধ করি সরাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি আহারটা আরম্ভ করিয়া দিল।

গৃহের একটি পাশে শৈলর অনতিদূরে যে রুক্ষকেশা, মলিনবেশা তরুণীটি বসিয়া নিঃশব্দে তাহার খাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, শৈল একবার চোখ তুলিলে দেখিতে পাইত, তাহার মৌন মুখখানির উপর বর্ষার কাল মেঘের মত পিতৃ-মাতৃহীনের গভীর শোক জমাট বাঁধিয়া থাকিলেও, অপরের বিষণ্ণ মূর্ত্তি ও শুষ্ক আননের পানে চাহিয়া তাহার অনুসন্ধিৎসু নারীচিত্ত ধীরে ধীরে যে কারণটা নিজের মনের মাঝে নির্ণয় করিতেছিল, তাহাতে শৈলর সহিত নিজের ব্যবধানটা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া লইতেছিল।

আহার শেষ হইয়া গেল—কিন্তু সম্পূর্ণ নীরবে। শৈল আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতে, অনিলা ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হাতে জল দিবার আদেশ করিল।

অনিলার জ্যেঠাইমা জয়ন্তী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বহির্বাটীতে বিরজামোহন যেমন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, অন্দর-বাটীতে তেমনই পত্নী জয়ন্তীকে গৃহিণী করিয়াছিলেন। পদমর্য্যাদোচিত কণ্ঠস্বরে তিনি শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"খাওয়া হ'ল, বাবা ?"

শৈল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার ভুক্ত-অবশিষ্ট আহার্য্যগুলার পানে চাহিয়া গালে হাত দিলেন। কহিলেন,—"ওমা! আমার কপাল!" অনুযোগ করিয়া শৈলকে কহিলেন, "কিছু খেলে না বাবা, দাঁত দিয়ে কেটেই উঠে পড়লে ?"

মৃদু হাস্যে শৈল কহিল,—"দাঁত দিয়ে কাটা আমার অভ্যাস নেই। সাধ্যমত যা খাবার তা খেয়েছি।"

—"তুমি জামাই মানুষ, ও-কথা তুমি বলবেই। হ্যাঁ রে অনিলা, তুই যে মা, এত বড় মেয়ে বসে থেকে খাওয়ালি? তা বলতে হয়। বাছা আমার কিছু খেলে না। একবার আমাকেও ত ডাকতে হয়?"

একটা অহেতুক আত্মীয়তা সৃষ্টি করিবার অছিলায় পাছে জয়ন্তীর মুখে অনিলাকে দু'কথা শুনিতে হয়, সেই আশঙ্কায় শৈল ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—"না, না, উনি কি করবেন? আমি আর খেতে পারতুম না। আপনি এসে অনুরোধ করলেও খেতুম না।"

শৈলর উত্তরের মধ্যে যে খোঁচাটুকু দেওয়া ছিল, শৈল মনে করিয়াছিল, তাহা এই ছদ্ম আত্মীয়তাকে আঘাত করিয়া অপরকে লজ্জা দিবে। কিন্তু গণ্ডারের চামড়া যেমন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলাকে উপহাস করে, তেমনই স্বার্থের চর্ম্মাবৃত মানুষের গায়ে অপরের বিদ্রূপ-রহস্যগুলা প্রতিহত হয়।

জয়ন্তী কহিলেন,—"তুমি না হয় না খেতে, স্বীকার কচ্ছি, অনিলার ত কর্ত্তব্য আছে। আমি একবার মনে করলুম আসি—আবার ভাবলুম, ডাগর মেয়ে খাওয়াচ্ছে। আমি বরঞ্চ এ-দিক্‌টা করি। জান ত বাবা, একা মানুষ, মাথার উপর সব।"

শৈলর সুগৌর মুখখানা পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এত বড় অভদ্র ইঙ্গিত মানুষের এই অতীব দুঃখের সময়—ব্যথার মুহূর্ত্তে যে করিতে পারে, তাহার অন্তরের নীচতা শৈলর চোখে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। অন্তরটা ঘৃণায় রি-রি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা যখন শ্বশুরের আত্মীয় বলিয়া অভিহিত ও অনিলার অভিভাবক হইয়া

রহিয়াছে, তখন ইহাদের আর সে কি বলিতে পারে? আর বলিবার আছেই বা কি? তাহার নিজের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাটা যদি অপরের চিত্তকে চঞ্চল করে, মুখ দিয়া শ্লেষ-বাণী বাহির করে, তাহার জন্য শৈল নিজেও কতকটা দায়ী। কারণ, আঘাতের প্রতিঘাত আছে।

অনিলা চোখ তুলিতেই অবসন্ন দিনের বিদায়ী—বিষণ্ণ রাঙ্গা আলোর মত শৈলর রক্তিম মুখখানা তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল এবং সেই নিমেষ দৃষ্টিপাতেই মুহূর্ত্তে যেন শৈলর মনের কথাটা নিঃশব্দে পড়িয়া লইল। অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আপনি ক্লান্ত, এইবার ও-ঘরে গিয়ে কাপড় বদলাবেন।" তাহার স্বরে একটা কর্ত্তৃত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

অনিলা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই জয়ন্তী হাঁকিয়া কহিলেন,—"অনু, ভাঁড়ার ঘরে তোর ফলের রেকাবীটা রেখে এসেছি মা, আর পাথরের গেলাসে সরবৎ আছে।" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ বাবা শৈল, তুমি বুঝি এখনও পাণ পাওনি—দেখেছ কি ভুল হয়েছে আমার! আর বাবা, ছোটরা চলে গেল," বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্যই বোধ করি মুখটা অন্য দিকে ফিরাইলেন।

শৈল উত্তর করিল, "আমি পাণ খাই না।"

—"পাণ খাও না! সাহেব মানুষ বলে বুঝি! আর কে-ই বা জোর-জবরদস্তি ক'রে খাওয়াবে? সবই আমাদের বরাত, বাবা।"

জয়ন্তী আঁচলে একবার চোখ মুছিলেন। কিন্তু এই অযাচিত স্নেহ-ধারা দিয়া যাহার অন্তরকে তিনি বিগলিত করিয়া বাধ্যবাধকতার বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা তাহার সম্বন্ধে সফল হইতে-ছিল কতটুকু, তাহা জানিতেছিলেন সেই সর্ব্বদ্রষ্টা।

শৈল হাসিল, কহিল, "অকারণ আপনি দুঃখ করছেন; পাণ আমি কোন দিন খাইনি। ছোটবেলা হতেই না।"

"তা জানি। ঠাকুরপো বলতেন, চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু শৈলচাঁদ আমার নিষ্কলঙ্ক। পাণ-সুপারিটি অবধি খায় না।"

বিমুখ দেবতাও স্তুতিগানে বিগলিত হইয়া বরহস্ত বাহির করেন। কিন্তু মানুষ সব সময় তাহাতে বশীভূত হয় না। জয়ন্তার প্রশংসার অতিশয়োক্তিটা তাই তাহার মুখখানাকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিল না। শুধু শ্মশ্রু-গুম্ফহীন ওষ্ঠাধরে যে হাসির রেখাটা ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্থটা যদি জয়ন্তী জানিতেন, তাহা হইলে পাণ খাইতে তিনি শৈলকে অনুরোধ করিতেন না।

জয়ন্তী আপনার কথা বজায় রাখিয়া কহিলেন,—"যতই তুমি সাহেব হও, পাণ না খাও বাবা, জানি ত—উপরোধে ঢেঁকিটাও মানুষ গেলে। শ্বশুরবাড়ী এসেছ, শালীদের মনস্তুষ্টির জন্য এ-ও তোমায় খেতে হবে।"

শৈল কোন কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ঢেঁকি গিলিবার কষ্টটাও মানুষ সহিতে পারে, কিন্তু দুইটা পাণ লইবার জন্য শৈল মুহূর্ত্ত অপেক্ষা অবধি করিল না।

ব্রজমোহনের গৃহে শৈলর জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ছিল। সেই কক্ষে আসিয়া কাপড় বদলাইয়া, বৈদ্যুতিক পাখার গতিটাকে সে দ্রুত করিয়া দিল। তার পর একখানি আরাম-চেয়ারের উপর ক্লান্ত দেহভারকে এলাইয়া দিয়া দুই চক্ষু মুদিল। নিদ্রা তাহার আসিল না। নিদ্রাহীনতার ক্লান্তি এবং অস্বোয়াস্তিও তাহাকে বিব্রত করিল না। চুপ করিয়া সে পড়িয়া রহিল। নিমীলিত চোখের পুরোভাগে অনিলার শোকাচ্ছন্ন ম্লান মূর্ত্তিখানি ভাসিতে লাগিল এবং তাহার স্বল্প ভাষণ, বাক্যালাপ, অবহিত অচঞ্চল আচরণের গভীরতা, এই আত্মীয়-স্বজনের পরিবেষ্টনের মাঝে

থাকিয়াও তাহার অপরিসীম দূরত্বটুকু স্বতঃসিদ্ধের মত শৈল অনুভব করিতে লাগিল। ধূপের মৃদুগন্ধ চিত্তকে পুলকিত করিয়া তোলার মত অনিলার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায় শৈলর সারা চিত্ত যেন একটা আনন্দ বোধ করিতে লাগিল।

সেই সময়ে একটি পঞ্চদশী কিশোরী, রূপার ডিবায় মিঠা পানের পরিপাটী খিলিগুলি লইয়া, কৌতুক-দৃষ্টিতে ব্রীড়াসঙ্কুচিত পদে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল

১৪
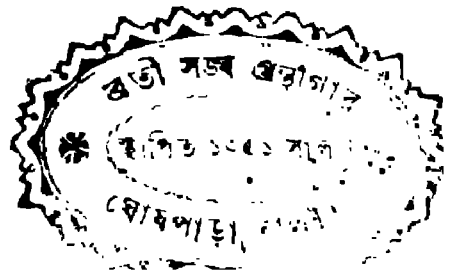
"পাণ নিন্।"

সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনিতে বিশ্রাম-মুদিত চক্ষু উন্মীলিত হইল শৈল কহিল,—"আমি ত পাণ খাই না।"

অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিরক্তিটা শৈলর কণ্ঠস্বরে চাপা রহিল না; কিশোরীর কাণেও ধরা পড়িল। নিমেষে তাহার সুগৌর মুখখানি রক্ত গোলাপের মত টক্‌টকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কোন উত্তর না দিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইয়াই—থামিল।

জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রস্থানোদ্যতা মেয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"পাণ দিলি, খুকি?" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"এই আমার মেয়ে শুভা। তোমার কাছে সবাই অচেনা।"

একটু-খানি হাসিয়া শৈল কহিল, "তা ঠিক। আমার শ্বশুর মশাই, আর মা ছাড়া এ বাড়ীর আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব অবধি আমি জানতুম না।"

জয়ন্তী যে অনেকখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখের চেহারাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু সহজে তিনি হটিবার পাত্রী ছিলেন না; কহিলেন,—"পরিচয় হ'বার সময়ই বা কোথা ছিল? নগরে উঠ্‌তে বাজারে আগুন! তা তুমি না জান্‌লেও আমি ত জানি।"—জয়ন্তী একটু থামিলেন।

শৈল কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, আবার আরম্ভ করিলেন,—"সকল দিনের সব কথাই জানি, শৈল! ঠাকুরপো তোমায় খরচ দিয়ে বিলাত পাঠালেন। মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন। কিছু ত আমার অজানা নেই।"

জয়ন্তী শৈলর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন; কিন্তু বাক্যের বিচিত্র কৌশলের যে তীক্ষ্ণ খোঁচাটা শরের মত তিনি শৈলর উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা শ্বশুরের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গেল। আক্রমণটা ব্যর্থ হইল।

হাসিমুখে শৈল প্রত্যুত্তর করিল, "সে ত জানবার কথাই—স্বদেশে বিদেশে আমার আত্ম-বন্ধু সকলেই এটা জানে, আর আপনি—যখন শুন্‌ছি তাঁর নিকট-আত্মীয়া, আপনি ত জান্‌বেনই।"

"শুধু আত্মীয় কি বাবা, সুনীলা, অনিলা তো আমার কোলেই মানুষ হয়েছিল।"

শৈল চেয়ারের উপর উঠিয়া বসিল, কহিল, "আপনি বরাবর শ্বশুর মহাশয়ের কাছে থাক্‌তেন?"—কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল, এবং তাহার মাঝে যে খোঁচাটুকু ছিল, তাহা কণ্ঠস্বরেই বুঝা গেল।

মদের মত ক্রোধটাও অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়া সত্য কথাটাকে বাহির করে। জয়ন্তী কহিলেন,—"না না, তা থাক্‌তে যাব কেন? পোড়া কপাল! ঐ যা পূজার ক'টা দিন থাক্‌তুম। অভাগ্যির দশা না হ'লে কি মানুষ পরের ঘরে বাস করে? বালাই! বালাই! এই তোমার শ্বশুরের খুড়ো ছিলেন আমার শ্বশুর। আর ঠাকুরপোর অল্প বয়সে বাপ মারা গিছ্‌লেন। খুড়োই হয়েছিল অভিভাবক। বুঝেছ বাবা! তাই সে আমাদের বড্ড—"

"ওঃ—" বলিয়া চেয়ারের পিঠে হেলিয়া, শৈল চোখ মুদিল।

জয়ন্তী কথা চালাইয়া কহিলেন, "তুমি বিলেত হ'তে যে দিন এ বাড়ীতে এলে—ঐ গিয়ে বম্বে হ'তে, সে দিন সকালে আমরা সবাই এখানে এসেছিলুম।" বলিয়া আবার কৈফিয়ৎ দিলেন; কহিলেন, "শুভাকে কি না ঠাকুরপো বড্ড ভালবাসতো! শুভা বল্‌তো, কাকামণি, আমি বিলেতের জামাই বাবুকে দেখ্‌বো।—তাই তিনি আমাদের সব আনালেন।"

শৈল আর সাড়া দিল না। এত-বড় কাহিনীটার এতটুকু তাহার কাণে গিয়াছে কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না।

জয়ন্তী একটু নীরব হইয়া মনে মনে কি ভাবিয়া লইলেন; কহিলেন, "আচ্ছা শৈল, তুমি না হয় আমাদেরই জান্‌তে না। অনিলা—তাকেও কি জান্‌তে না?"

জয়ন্তী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শৈল চোখ খুলিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে নিজের সমস্ত অন্তরটা দেখিয়া লইয়াছিল; কহিল,—"জান্‌তুম বা জান্‌তুম না, কোনটাই ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পারছি না। আমার বিয়ের সময় একটি ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়েকে আমি দেখেছিলুম। তার পর অনেকগুলা বছর কেটে গিছ্‌লো। অনেক ভাঙ্গা-চোরা হয়ে গেল। সে কথা আমার মনেই ছিল না। আর কেউ আছে, এ খেয়ালও আমার ছিল না।"

শৈল চুপ করিল।

জয়ন্তী কহিলেন,—"বোধ করি ইচ্ছে ক'রেই করেছিলেন। তার দু'টি মেয়ে রূপের ডালি ছিল। যে ভাগ্যিমানি, সে চ'লে গেল। সারা সংসারটা তার জন্যে হাহাকার করলে। ছোট বউ পাগল হ'ল। যার যেমন কর্ম্মফল!"

জয়ন্তীর উপর শৈলর মনটা প্রসন্ন ছিল না ; কিন্তু এখন যেন তাহা তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। তথাপি ইনি শ্বশুরের মাননীয়া আত্মীয়া বলিয়া মনের ঘৃণাটাকে সংযমের আবরণে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু মনের বিরুদ্ধে মানুষ জোর করিয়া বেশীক্ষণ চলিতে পারে না ; তাই চোখের উপর হাতটা চাপা দিয়া সে নিঃশব্দে ঘুমাইবার ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করিল।

জয়ন্তী বুঝিলেন, এইবার তাঁহাকে উঠিতে হইবে। চোখের ইসারায় মেয়েকে তিনি কক্ষের একটি পাশে আড়ষ্টের মত আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া, এমন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন অকাশ হইতে খসিয়া পড়িলেন! কহিলেন,—"হ্যাঁ রে শুভা, মুখখানি অমন কাঁচু-মাচু ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? জামাই বাবু তোর পাণ খেলে? সুপুরি কাট্‌তে ত আঙ্গুল কেটে রক্তারক্তি কর্‌লি!"

চাঁদের আলো যেমন রাজপ্রাসাদ, দীনের কুটীর মানে না, বিনা দ্বিধায় সে আপনার স্নিগ্ধ আলোটুকু সমভাবেই ছড়াইয়া যায় ; স্নেহ-কোমল চিত্ত তেমনই অপরের দুঃখ বা বেদনার আভাস পাইলেই ক্ষুব্ধ হয়। আত্মপর চিন্তা করে না। শৈল চমকিত হইল। তাহার জন্য একটি বালিকা এতখানি কষ্ট করিয়া যত্ন-উপহার লইয়া আসিয়াছিল। রূঢ় আচরণে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে!

জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; মেয়েকে বকিতে লাগিলেন, "সব কাযেই তোর তাড়া ; বল্‌লুম, দুটো পাণ দে শৈলকে—আমি দেব মা, আমি দেব মা! এখন আঙ্গুলে ব্যথা হ'ল। এক্‌জামিন দিবি কি ক'রে?"

সলজ্জ মুখে মেয়ে কহিল,—"ও কিচ্ছু না। কালই সেরে যাবে। তুমি কেন বল্‌লে না, জামাই বাবু পাণ খান্ না?"

য়ে কাযটা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহা করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। জয়ন্তী যেটাকে সহজে করিবার জন্য সচেষ্টভাবে বাক্যাড়ম্বর করিতেছিলেন, বেদনা ছড়াইতেছিলেন, সেটা কিন্তু ততই জটিল হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু বালিকার কণ্ঠে সরল অভিযোগে তাহা সোজা হইয়া গেল।

শুভার মুখের পানে চাহিয়া, সস্নেহ কণ্ঠে শৈল কহিল,—"পাণের ডিবেটা কই?"

বর্ষার আকাশ শরতের প্রথম আলোকস্পর্শে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠার মত, জয়ন্তীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখখানা নিমেষে উজ্জল হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন,—"ও মা! তুমি বুঝি ভাবছিলে ডিবেতে আরস্কুলা ভরে দিয়েছে? তাই পাণ নাওনি। আচ্ছা শুভা, জামাই বাবু তোরে যখন সন্দেহই করছে, তুই নিজে-হাতে ওকে পাণ দে।"

কম্পিত হাতে ডিবাটা খুলিতেই শৈল হাত বাড়াইয়া মিঠা পাণের খিলি তুলিয়া লইল। কহিল,—"পাণ আমি খেতুম না, শুধু তুমি ছেলে-মানুষ আঙ্গুল কেটেছ ব'লে খেলুম।"

কথাগুলা সে শুভার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেও চাঁদের উপর মেঘাবরণের মত জয়ন্তীর উজ্জল মুখের উপর একটা অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শৈল ইচ্ছা করিয়াই শুভার হাত হইতে পাণ লইবার দায়টা এড়াইয়া গেল।
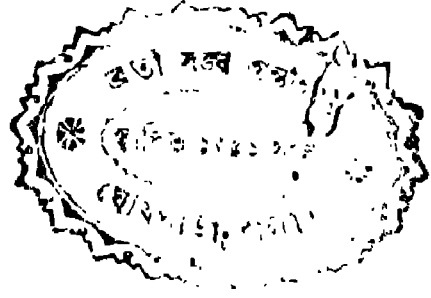
১৩

৺ব্রজমোহন বসুর পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন আসন্ন। বৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আত্মীয়-কুটুম্বতে ভরিয়া উঠিতেছে। সংগোপনে শৈল অবনী বাবুর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কহিল,—"খরচটা আপনি একটু বুঝে করবেন—আমি কিছু বলতে পারব না।"

মাথা নাড়িয়া অবনী কহিলেন, "সে তুমি না বল্‌লেও আমায় করতে হ'ত বাবা! এটর্ণি-বাড়ীতে কায ক'রে চুল পাকালুম, কত রকম লোক দেখ্‌লুম—এক আঁচড়ে সব বুঝ্‌তে পারি।"

ব্যস্ত হইয়া শৈল কহিল,—"ও-সব কথা যাক্, যা কিছু ত এই ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু একটা কথা, টাকাটা যে আমি দিচ্ছি, অনিলা যেন তা' না বুঝতে পারে। তা হ'লে সে হয় ত সব বন্ধ ক'রে দেবে।"

অবনী একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন,—"তার কাছে কোন কথা গোপন রাখা শক্ত। ভগবান্ এত অল্প বয়সে ওর সব কেড়ে নিয়েছেন বলেই বুদ্ধিটা ওকে একটু বেশী পরিমাণে দিয়েছেন! এই যে এত-বড সংসারটা, এর সব ভার-ব্যবস্থাই ত ঐ অতটুকু মেয়ের কাঁধে চাপান ছিল। ওর মা ত অনেক দিনই সংসার ছেড়েছিলেন। বাপের অবস্থা এতটুকুও ওর কাছে গোপন নেই। তাই এক এক সময়ে অবাক্ হয়ে ভাবি, এতগুলা লোকের চোখের উপর নিজেদের মন্দ অবস্থাটাকে পরের চোখে কেমন ক'রে আড়াল করত, এই অর্থ-সঙ্কটের মাঝেও

দপ্তরের সামনে কেমন ক'রে স্বচ্ছলতা শৃঙ্খলা বজায় রাখত, এ শুধু ওই বল্‌তে পারে।"

অবনীকে টাকা দিয়া শৈল ফিরিয়া আসিল। বর্ষার অশ্রুসিক্ত আকাশের ম্লান মুখ, শরতের সোনালি আলো যেমন মুছিয়া দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনই একটা মনোরম তৃপ্তি, গভীর স্বস্তি, আকস্মিক কোথা হইতে আসিয়া শৈলর মনের বিষণ্ণতাকে ধুইয়া মুছিয়া চিত্তটাকে উল্লসিত করিয়া তুলিল।

বেলা অনেকটা বাড়িয়াছে। সকালে চা, বিস্কুট খাইয়া সেই যে সে বাহির হইয়াছে, তথাপি খাইবার কথাটা শৈলর আদৌ মনে পড়িল না। ভাবনা-হীন বিশ্রামের মধুর আস্বাদকে সে শুধু সকল দেহ-মন দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল।

এই অপ্রত্যাশিত উল্লাসটা আকস্মিক কোথা হইতে আসিয়া শৈলর চিত্তকে অধিকার করিল, তাহা বলা কঠিন। শ্বশুরের শ্রাদ্ধক্রিয়ার টাকাটা অবনীর হাতে সকলের অজ্ঞাতে দিতে পারিয়াছে বলিয়া, কিম্বা যাহাকে দয়ার পাত্রী বলিত, সেই সে তাহাদের অনেকের উপরে; তাহার হাত ধরিয়া চলিলে চোখ বুজিয়া জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল পথে কোথাও বাধে না, এই শুভ সংবাদটার জন্য কি না, কে বলিতে পারে?

শুভা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। আহার্য্য-ভরা রেকাবীখানা টেবলের উপর রাখিয়া কহিল,—"মা ব'লে দিলেন, আপনি এগুলা খেয়ে তবে স্নান করতে যাবেন।"

মানুষের মন যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন বিরক্তিকর বস্তুটাকেও সে ভাল চোখে দেখে। অতি তুচ্ছ বস্তুর মাঝেও সে তখন আনন্দকে খুঁজিয়া পায়। স্মিতমুখে 'তথাস্তু' বলিয়া সে শুভার দিকে হাতটা বাড়াইয়া দিল। অন্য সময় হইলে, টেবলের উপর যেমন রাখিয়াছিল

তেমন রাখিতে আদেশ করিত। এমন করিয়া ব্যগ্রহস্ত সে বাড়াইত না।

শুভা টিপয়টা টানিয়া খাবারের থালাটাকে শৈলর সম্মুখে রাখিল। শৈলর যেন ত্বরা সহিতে ছিল না, এমনই করিয়া সে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শুভা হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—"আজ খাবারগুলা কেমন হয়েছে, জামাইবাবু?"

কচুরীতে একটা কামড় দিয়া শৈল কহিল,—"আহা, যেন অমৃত!"

শুভার সাহস বাড়িয়া গেল। মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তথাপি তাহার কৌতুকপ্রিয় বালিকাচিত্ত পরিহাস করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল,—"আজ বুঝি খাণ্ডব-দাহন শেষ হ'ল?"

শৈল হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—"হ্যাঁ, এমনি ক'রে বেলা বারটা অবধি পিত্তি চুঁইলে, শুধু খাণ্ডব-দাহন নয়, অনেক কিছু দাহন হয়ে যাবে, ভাই!"

শৈলর কথা শুভা মনে মনে বিশ্বাস করিল, তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা ভাবিয়া, ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—"আহা, আপনি যে সেই সকালে গাড়ী নিয়ে বেরুলেন, আমি মনে করলুম, পাটনাতে বুঝি পাড়ী দিলেন। অনিলাদি ত আপনার আশা-পথ চেয়ে খালি ঘড়ি দেখ্‌ছিলেন।"

শৈলর হাসিমুখ মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। সে কহিল,—"ঘড়ি তিনি দেখ্‌তে পারেন, তবে সেটা আমার জন্যে—তুমি বুঝ্‌লে কি ক'রে?"

প্রশ্নটা শৈল সহজ কণ্ঠে করিয়াছিল। তথাপি তাহার সেই মুহূর্ত্ত-গম্ভীর মুখখানা শুভার দৃষ্টি এড়ায় নাই। নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল। রহস্য-সম্পর্কীয়া বলিয়া শৈলর কাছে সে যত আবদার করিয়া উপস্থিত হউক, ঘনিষ্ঠতা তাহার সহিত যতই থাকুক, কিন্তু অনিলার নাম লইয়া এ-দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবার অধিকার তাহার আজও হয় নাই। এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝিয়া অন্তর তাহার শুধু সঙ্কুচিত হইল না; সে একটু ভয়ও পাইল। ভয়টা শৈলকে লইয়া নহে, অনিলাকে লইয়া। অন্তরের সবখানি শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া সে অনিলাকে ভালবাসিত। তথাপি এই ইঙ্গিতটা সে করিয়া ফেলিয়াছিল, মেয়ে-মানুষ বলিয়া! কিন্তু অনিলার প্রকৃতি সে অবগত ছিল। গায় পড়িয়া কোন আলোচনা সে সহিতে পারে না। তাহার আত্মাশ্রয়ী গূঢ় বেদনা পাছে অপরের অযাচিত সহানুভূতিতে সঙ্কুচিত হয়; তাই সতর্কতার সহিত আপনাকে সে সকলের কাছ হইতে সরাইয়া রাখিত। শুধু শুভাকে সে অকৃত্রিম স্নেহে ছোট বোনটির মত আপনার পাশে অনুক্ষণ রাখিত। কিন্তু এই কথাটা যদি কোনক্রমে অনিলার কাণে উঠে, তাহার পর শুভার আসনখানি পূর্ব্বের মত ঠিক থাকিবে কি না, এই চিন্তায় শুভা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শৈলর আহারটা শেষ হইল। শুভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "বাবা আপনাকে ডেকেছেন। ব'লে দিয়েছেন, বিশেষ দরকার আছে।"

শৈল কহিল, "জ্যেঠা মশাই যদি বিশেষ দরকার ব'লে আমায় ডেকেছেন, ত তুমি এতক্ষণ আমায় তা বলনি কেন?"

"মা আপনার খাবার আগে বলতে মানা করেছিলেন।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না। ইহাতে শুভার অন্যায় কিছু হয় নাই, অপ্রীতিকরও কিছু ঘটে নাই। তথাপি সে-দিনটা শরতের পীতাভ দিনটির মত শৈলর চোখে বড় মিষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহাতে একটা ছায়াপাত হইল। মনটাও তিক্ত হইয়া উঠিল।

শৈলকে পাইয়া বিরজামোহন কহিলেন, "অনিলা কি বলেছে, শুনেছ? সে বাপের কায আমাদের কথামত করবে না।" আগুনে-পোড়া লোহার মত তপ্ত রক্ত-চোখে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আজ যদি ব্রজর একটা ছেলেও থাকত—"

জয়ন্তী স্বামীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন,—"এতেই লোকে বলে, ছেলে আর মেয়ে। বাপ-মায়ের কায ছেলেতে ভিক্ষে ক'রে করতে লজ্জা পায় না। কথায় ব'লে, পিতৃ-মাতৃ-দায় মহাদায়। আর টাকা থাকতে, শুধু মেয়ে বলেই ওর মুখ দিয়ে বার হ'ল, আমি অত খরচ করবো না। ঠাকুরপোর অনিলা-অন্ত প্রাণ ছিল কি না—"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তুমি একবার বোঝাবার চেষ্টা কর, শৈল। আমাদের কথা কাণে নেবে, যে মেয়েই সে নয়।"

পথে আসিতে আসিতে শৈলর বুকের মাঝে এমনি একটা কথা শুনিবার আশঙ্কা জাগিতেছিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল,—"তিনি কি করবেন বলেছেন?"

—"বলেছেন মাথা আর মুণ্ডু!"

বিরজামোহন মনের সব রাগটুকু দু'খানি হাতের বিচিত্র ভঙ্গীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"নিজেই ফর্দ্দ করেছেন। দানসাগর ত দূরের কথা, বৃষ উৎসর্গ অবধি করবে না। না অধ্যাপক বিদেয়, না কিছু। পাঁচটি বামুন আর গুটিদশেক কাঙালী খাওয়াবে। আর যারা

ব্রজর সঙ্গে গেছল, বাড়ীতে এসেছিল, তাদের খাওয়াবে। ব্রজর খাতা ধরে নিমন্ত্রণ হ'ত, সেই ফর্দ্দ শুনাতে গিয়ে এই বিপত্তি। বোঝালুম, সে একটা মানী লোক ছিল। দিক্‌পালের সঙ্গে লোকে তার তুলনা দিতো, তার কাম হবে তিল-কাঞ্চনে ?"

শৈল কহিল, "তিল-কাঞ্চনের খরচ কত ?"

মুখ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জয়ন্তী কহিলেন,—"শ'তিনেকের মধ্যে ত সব সারবার ব্যবস্থা হয়েছে, দেখলুম।"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তাই বা দরকার কি ছিল ? ব্রজর অদৃষ্ট মন্দ, ছেলে না হয় নেই, সুনিলাটাও যদি বেঁচে থাক্‌ত, আজ ভাবনা কি ? আমি দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি, সে কখনও এমন হ'তে দিত না। বাপের মত সে-ও একটা কলিজাওলা মেয়ে ছিল ! ভগবান্ ভালটাকেই কেড়ে নেয়। ও ছোট বেলা হ'তে কঞ্জুস জানি।"

জয়ন্তী গপ্ করিয়া কহিলেন,—"ফলও পাচ্ছে। ও যেমন কাউকে দিতে রাজি নয়, ভগবান্‌ও তেমনি ওকে দিতে রাজি নয়। তা না হ'লে ওর মত রূপ কার ছিল ?"

শৈল কথাটাকে সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিরজামোহন পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন, জয়ন্তী একটা অর্থসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া হাঁকিলেন, "শুভা !" কন্যা নিকটে আসিতে কহিলেন,— "শৈল অনিলার দিকে যায় কি না দেখিস্ ত।"

শুভা মাথা নাড়িয়া কহিল,—"না, না, জামাইবাবু একবারও ওদিকে যান্ না। অনিলাদি ত ডাকে না। সেই প্রথম দিন যা ডেকেছিল।"

জয়ন্তী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—"তুই ত সব জানিস, খালি সন্দারি!"

মায়ের বকুনীতে শুভা কিন্তু দমিল না। প্রবল বেগে আপত্তি করিয়া কহিল,—"আমি রাতদিন থাকি, দেখ্‌তে পেতুম না? জামাই-বাবু হয় নিজের ঘরে, না হয় নীচে দাদা কি বাবা—ওদের কাছেই কথা কয়।"

১৬

হবিষ্যান্ন শেষ করিয়া একটু গড়াইবার জন্য অনিলা পাথরের মেঝেটা নিজের আঁচল দিয়া মুছিতেছিল ; শৈল ঝড়ের মত আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল,—"তুমি কি গোল বাধিয়েছ ?"

অনিলা কোন কথা না কহিয়া এক-পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মৌন মূর্ত্তির পানে চাহিয়া, শৈল নিজের উত্তেজনাটা বুঝিতে পারিল। অপ্রতিভ হইয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল,—"সব দিক্ চেয়ে কায করা ভাল। এমন ভাবে বাবার কায আমরা করলে, চারিদিক্ থেকে একটা ভয়ানক নিন্দা শুন্‌তে হবে।"

অনিলা মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

শৈল একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে সে এমন করিয়া ভুল করিত না। অনিলার উক্তিকে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ সে উদীপ্ত হইয়া উঠিল। আর এক জনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল। শৈল কহিল,—"আমায় তিনি ছেলের চোখেই দেখতেন, এ-কথা যেমন আমি জানি, তেমনি আর পাঁচ জনেও জানেন।"

অনিলা তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমিও তা জানি এবং এটা যে কতখানি সত্য, আমার চেয়েও তা কেউ বেশী জান্‌তে পারে না। আর

আপনিও ত সেই পুত্রের কাযই করছেন। এও ত সবাই দেখ্‌তে পাচ্ছে।"

"তবে এ-রকম ভাবে তাঁর কায ক'রে আমাকে তুমি ছোট ক'রে দিচ্ছ কেন? লোকসমাজে আমার মুখ দেখাবার পথ বন্ধ করছ। কিসের জন্যে তুমি এমন ক'রে ক্ষতি করছ?"

শৈলর উত্তেজিত কণ্ঠের কথাগুলি যেন একটা অভিযোগের মত শুনাইল।

আশ্চর্য্য হইয়া অনিলা ক্ষণেক শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পরে কহিল, "আমি যদি আমার ইচ্ছামত বাবার কায করি, এতে আমায় ছেড়ে লোকে আপনার ওপরেই বা দোষারোপ করবে কেন? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

শৈল হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "অনিলা, সকলে বলে তুমি খুব বুদ্ধিমতী। কিন্তু এটুকু যে কেন বুঝ্‌তে পারছ না, এ আমার দুর্ভাগ্য!"

অনিলা চুপ করিয়া রহিল। শৈলর অন্তরের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে একটা সাড়া অবধি দিল না। মুখেরও কোন ভাবান্তর ঘটিল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া শৈল কহিল,—অবনী বাবু কি তোমায় জানান্‌-নি যে, তাঁর কাছে টাকা আছে?"

অনিলা কহিল,—"হ্যাঁ, তিনি জানিয়েছেন, পাঁচ হাজার টাকা তাঁর হাতে বর্ত্তমানে মজুত আছে।"

বর্ষার ঘন মেঘস্তরকে হঠাৎ দুই পাশে ঠেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্ন-রবি মুখ বাহির করিল। উজ্জ্বল মুখে শৈল কহিল,—"তবে তোমার আপত্তি কি?"

অনিলা কোন উত্তর করিল না। বাদানুবাদ করা তাহার স্বভাব নহে। একটা স্বভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্য দ্বারা সকলের সহিত সে

ব্যবধান রাখিয়া চলে, ইহা শৈল বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা অসম্মতি বা প্রচ্ছন্ন বিরক্তির পরিচায়ক নহে। মনে মনে এই অনুমান করিয়া স্মিতমুখে শৈল কহিল,—“আমাদের মতের তবে মিল হল অনিলা?”

অনিলা মুখ তুলিয়া চাহিয়া, কহিল, “আমি যা স্থির করি, কারুর কথায় তাকে অস্থির করি না।”

শৈল চমকিয়া উঠিল। নিজেকে অকস্মাৎ ভয়ানক অপমানিত জ্ঞান করিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে অন্তরটা তাহার দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুগৌর মুখখানা নিমেষে সিঁদূরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আপনাকে যথাসাধ্য চেষ্টায় সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে সে কহিল,—“মানুষ সব দিতে পারে, দিতে পারে না শুধু নিজের মর্য্যাদাকে। আর একেই বজায় করতে সেখানে যত কিছু ত্যাগ মহত্ত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামের বনবাসই বল, সীতার পাতাল-প্রবেশই বল—মনুষ্যত্বের প্রকাশ এইখানে। আজ আমি যে অনুরোধ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম, তার মাঝেও সেই মর্য্যাদা দাঁড়িয়েছিল। যার জন্যে তোমার বাবা এমন ক'রে মৃত্যুর রাজ্যে চলে গেলেন।”

অনিলা নিঃসঙ্কোচে শৈলর দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, “আমার উত্তর আপনার মুখ দিয়ে বার হয়েছে। বাবার সব চেয়ে বড় যা, যার তলায় নিজেকে তিনি বলি দিয়েছেন, আমি তাকেই বজায় রাখতে ঘরে-বাইরে বিরোধ তুলতে ভয় পাচ্ছিলুম।”

—“তাকেই বজায় রাখতে?” একটা কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে শৈলর মুখ ভরিয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল। অনিলা কিন্তু এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না; দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ, আমি প্রাণপণে বাবার যে সম্ভ্রমটা বজায় রাখতে চাচ্ছি, এই এতগুলা লোক যা ভাঙ্গতে

চাইছে। আপনি ছেলের দাবীতে তাদের সাথে যোগদান করে বাবার সেই সম্ভ্রমটুকু নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন।"

এই অচিন্তনীয় অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত কথাটায় শৈলর মুখ পলকে বিবর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখে প্রেতাত্মা দেখিলে মানুষ যেমন ভীতদৃষ্টিতে চায়, তেমনই করিয়া অনিলার পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "আমি তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট করতে চাইছি?"

দৃঢ়কণ্ঠে অনিলা কহিল, "জ্ঞাতে হোক্, অজ্ঞাতে হোক্, আঘাত করলেই বেদনা লাগে। নিজের কর্ম্মের জন্য অথবা অদৃষ্টের জন্য বাবার অর্থের পরমায়ু নিঃশেষ হয়েছে বলেই কি তিনি জীবনে যা করেননি, আমি তাঁর মেয়ে হয়ে সেই কায করব? আপনি এটা বিশ্বাস করেন?"

শৈল কহিল, "টাকাটা ত অবনী বাবুর কাছ হ'তে পাচ্ছ! আর তাই জানবেও সবাই।"

অনিলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আপনার মুখে এ রকম শোনবার আশা আমি করিনি।"

অনিলার হাসিটুকু শৈলকে বিঁধিল। অপ্রতিভ কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু আমি যতদূর তাঁকে জানি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি দিলে তিনি আপত্তি করতেন না। অপ্রীত হতেন না।"

অনিলা কহিল, "হ'তে পারে তা। কিন্তু আপনি ত তাঁকে দিচ্ছেন না। আপনার কাছ হ'তে তিনি কিছু নিচ্ছেন না। দেব আমি তাঁকে—" অনিলা একটুখানি থামিল, কণ্ঠস্বর ভারী হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া কহিল, "বাবা-মা আমার কাছেই হাত পাতবেন। আমার সামনেই তাঁরা দাঁড়াবেন—" অনিলা আবার থামিল। সূর্য্যদীপ্তিকে চলন্ত মেঘে আড়াল করার মত, একটা বেদনার ছায়া তাহার সঙ্কল্পকঠিন

মুখখানিকে বার বার পাণ্ডুর করিয়া তুলিতেছিল। তাই কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া মনের মাঝে একটা বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, "আমার যা শক্তি, তাই দিয়েই আমি স্বর্গবাসী বাপ-মায়ের পূজা করতে চাইছি, এতে তাঁরাও তৃপ্ত হবেন, আমিও আশীর্ব্বাদ পাব।"

শৈল অনিলাকে চিনিয়াছিল। বুঝিল, এ মেয়েটি যে দুর্ভেদ্য প্রাকার নিজের চারিপাশে রচনা করে, তাহাকে ভেদ করিবার শক্তি কেহই পায় না। শৈলও না। অন্তর-দুয়ারের অর্গল চিররুদ্ধ করিয়া ইহার মন যেন নিজেকে একাকী রাখিবার বাসনায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু এমন দীনহীন-ভাবে শ্বশুরের পারলৌকিক ক্রিয়াটা সম্পন্ন হইতে দিতে শৈলর অন্তরও কিছুতে সম্মত হইতেছিল না। শৈশবে পিতৃহারা সে, পিতার সব শ্রদ্ধা, ভালবাসা সে শ্বশুরকে অর্পণ করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে শৈল কহিল, "অনিলা, ভয়ানক শোকে মনটা তোমার এখন আচ্ছন্ন, তাই আবেগের মাথায় তুমি ও-রকম করতে চাইছ। কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেকখানি বড়, আঘাতও অনেক খেয়েছি। তার অভিজ্ঞতা হতেই বলছি—এটা তোমার সঙ্গত হবে না।"

স্থিরদৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিয়া, অচঞ্চল কণ্ঠে অনিলা কহিল, "কেন হবে না?"

—"কেন হবে না? তিনি যে আত্মসম্ভ্রমটা ভালবাসতেন। প্রাণের চেয়েও সেটাকে তিনি মূল্যবান্ মনে করতেন, সেই তাঁর—"

বাধা দিয়া অনিলা কহিল,—"আমি ত তাঁর কায দীনহীনের মত করতে চাই না, আপনি আমায় সেই পরামর্শ দিচ্ছেন?" অনিলার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল।

"আমি—?" শৈলর মুখে অদৃশ্য-হাতে কে যেন একমুঠা ছাই মাখাইয়া দিল। দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণেক অনিলার

পানে সে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনিলা এতটুকু বিচলিত হইল না; দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"হ্যাঁ, আপনি। আমার যা সাধ্য, আমি তাই দিচ্ছি। এতে দীনতা প্রকাশ পায় না, এ-কথা ত বলেছি। দীনতা প্রকাশ পায় শুধু পরের কাছে হাত পাতলে। আমি ভিক্ষা ক'রে বাপ-মা'র কায ক'রে তাঁদের ছোট ক'রে দেব, এ-কথা আপনি ভাবতে পারেন।"

যে মেঘখণ্ড সূর্য্যালোককে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল, অনিলার এই কথা কয়টায় তাহা যেন নিমেষে অপসৃত হইয়া গেল। মেঘনির্ম্মুক্ত রবিকরের কোথাও ঝাপসা রহিল না। শৈল দেখিতে পাইল, অনিলার আপত্তি কোথায়? কেন? অন্তরটা তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা তরুণীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠে সে কহিল,—"আমার কাছ থেকে নেওয়া তোমার ভিক্ষা নয়, অনিলা! নেবার অধিকার আছে—আর তা দিয়ে গেছেন, তোমার বাবা নিজে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে অনিলার বুদ্ধিবৃত্তি কয়েক মুহূর্ত্ত যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। বিবর্ণমুখে অর্থহীন দৃষ্টিতে শৈলর মুখের পানে ক্ষণেক সে তাকাইয়া রহিল। তারপর কহিল,—"বাবা? অসম্ভব!"

অনিলার ম্লান মুখ, কুণ্ঠিত দৃষ্টি ও স্তম্ভিত ভঙ্গীর পানে চাহিয়া শৈলর অন্তরটা যেন জয়ের আনন্দে ভরিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল,—"হ্যাঁ, তিনিই দিয়েছেন। প্রমাণ আমি দেখাতে পারি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা উল্লাস উদ্বেলিত হইল। শেষ মুহূর্ত্তে বাজী যেন জিতিয়াছে। ঠিক সেই সময় জয়ন্তী পর্দ্দা ঠেলিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।
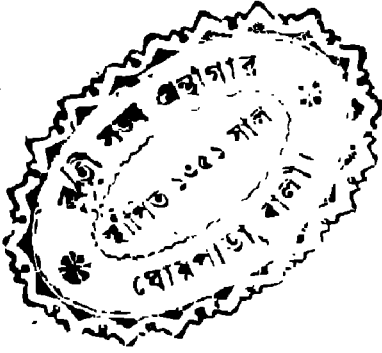
মিত্র-সাহেব কন্যার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—"তা হ'লে শৈলর ফিরতে একটু দেরী হ'বে। অনিলার একটা ব্যবস্থা না ক'রে সে আসবে কি ক'রে? আহা, বেচারা মেয়ে!"—বলিয়া অসহায়া বালিকার দুঃখের সমবেদনায় তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন! কিন্তু তাহা অপেক্ষা শতগুণ গভীর বেদনার নিশ্বাস যে তাঁহার নিজের কন্যার হৃদয়ের মূল অবধি তরঙ্গাহত করিয়া তুলিল, তাহা মিত্র-সাহেব জানিতেও পারিলেন না।

সুলেখা হাতের বইখানির পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কহিল, "অনিলার সম্বন্ধে অপরের ত কিছু করবার নেই। যা করবার তার বাবাই ত ক'রে রেখে গেছেন।"

কন্যার নির্বুদ্ধিতায় মিত্র-সাহেব ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু জীবনে যে দুঃখের মুখ দেখে নাই, মানুষের অবস্থা-সঙ্কট সংসার-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি সে পাইবে কোথা? ইহাই ভাবিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখশ্রীতে ছায়াপাত হইল না। সহজ-কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ব্রজ ব্যবস্থা ক'রে গেছে! কি বল্‌ছ, লেখা? ব্রজকে আমি খুব ভাল-বাসলেও, নিজের মেয়ের যে অবস্থা ক'রে গেছে, তার জন্যে আমি মুক্তকণ্ঠে তার নিন্দা করি। একটা গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা অবধি রেখে যায় নি।"

নতনেত্রে সুলেখা কহিল, "আমি যত দূর জানি, তাতে মনে হয়, জ্যেঠামণি অনিলার জন্যে যদি কিছু টাকা-কড়ি রেখে যেতেন, তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া মিত্র-সাহেব কহিলেন, "তবে কিসে সুবিধে হ'ত? ভগবান্ তার যা করেছেন, তাতে বিয়ের—" মিত্র-সাহেব থামিয়া কহিলেন, "সাংসারিক জীবনে অর্থ না হ'লে এক পা চলার উপায় নেই। মানুষের যত কিছু শক্তির বিকাশ তার মূলে এই অর্থ। সেই জন্যেই এই বিশ্বজোড়া কাড়াকাড়ি মারামারি।"

সুলেখা কহিল, "বাবা, তোমার কথাটা আমি খুব মানি। অর্থ-ই মানুষের শক্তি। আর এই অর্থের জোরেই তিনি অনিলার শক্তি, সামর্থ্যটুকু রেখে গেছেন।"

মেয়ের কথার হেঁয়ালি মিত্র-সাহেব কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এতগুলা কথার মাঝে সুলেখা যে কিসের ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা এই সুবিখ্যাত আইন-জীবীর কূটজ্ঞ বুদ্ধির অগম্য হইল। কারণ, মানুষমাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে। ইঁদুরের মত মাটী খুঁড়িয়া পরের সবটুকু তন্ন-তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেও স্নেহের আচ্ছাদনে ঢাকা অনেক কিছু সে দেখিতে পায় না।

মিত্র-সাহেব কহিলেন—"লেখা, তোমার বক্তব্যটা একটু স্পষ্ট ক'রে বল।"

সুলেখার আনত দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের উপর আবদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু মৃদু কণ্ঠস্বর শব্দগুলিকে স্পষ্টরূপেই উচ্চারণ করিল। সুলেখা কহিল—"মিঃ রায়ের উপর অনিলার সব দাবীই জ্যেঠামণি রেখে গেছেন।"

মিত্র-সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"বাই জোভ! শৈলকে লক্ষ্য ক'রে তুমি এত তর্ক আমার সঙ্গে কচ্ছিলে! কিন্তু লেখা, কথাগুলা তোমার বড্ড ছেলেমানুষের মত হ'ল। স্বীকার কচ্ছি, শৈল তার আত্মীয়, তাকে দেখ্‌বে, অর্থসাহায্য করবে। কিন্তু অনিলার আত্মমর্য্যাদা কি স্মরণ করিয়ে দেবে না, শৈলর কাছে হাত পাত্‌তে হচ্ছে?" কথাটার শেষ দিকে মিত্র-সাহেবের কণ্ঠস্বর করুণায় বিগলিত হইয়া উঠিল। অনিলার বিলি-ব্যবস্থাটা মিত্র-সাহেবের কাছে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শৈল তাহার জন্য কতখানি কি করিতে পারে, এবং কি করিবে, তাহাও জানিবার একটা ভয়ানক আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উদার প্রাণ, নিঃসহায় বন্ধুকন্যার জন্য বাস্তবিকই পীড়া অনুভব করিতেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতে যে নিজের ঘরের কোণে আর একটা বড় সমস্যার উদ্ভব হইয়া বিন্ধ্যা-চলের মত মাথা তুলিয়া তাঁহার আনন্দের সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। ভবিষ্যৎ কালো পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে।

সুলেখার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মনের একটা দ্বিধাকে সজোরে সরাইয়া সে কহিল—"স্বামীর কাছে হাত পাততে ত লজ্জা নেই। তাতে আত্মসম্মানে ব্যাঘাত ঘটে না।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একটা ধ্বনি করিয়া মিত্র-সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—"স্বামী—? হোয়াট্ ইস্ দিস্! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! লেখা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

অনেকখানি চিন্তা-তর্ক-যুক্তি দিয়া দিনের পর দিন ধরিয়া সুলেখা নিজেকে প্রস্তত করিয়াছিল। কিন্তু বন্যার বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত জলরাশি

যেমন প্রচণ্ড আঘাতে নদীর শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দেয়, তেমনই জনকের বিস্ময়ের আঘাতে সুলেখার অন্তরের সব শক্তি যেন নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। আত্মসংযমের কঠিন বাঁধনটা মুহূর্ত্তে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া পড়িল। পিতার মত সে-ও ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল। সম্বিৎ পাইল পিতার স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে।

মিত্র-সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া কন্যার কাছে আসিয়াছিলেন। সস্নেহে তিনি মেয়ের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে কহিলেন,—"ও-রকম ভয়ানক চিন্তাগুলা তোর করবার কোন কারণ নেই, মা!...শৈলর উপর অবিচার করিসনি।"

বুকের মাঝে নিরুদ্ধ একটা আকুল ক্রন্দন এই স্নেহের স্পর্শটুকু পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া সুলেখার কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিল। কিন্তু পিতার সম্মুখে ইহা প্রকাশ হইলে একটা অপরিসীম লজ্জা তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে, এই জ্ঞানটুকু তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বয় আসিয়া জানাইয়া গেল, চা দেওয়া হইয়াছে। কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"চল, মা, চা খাইগে।"

চায়ের টেবলের চেয়ার অধিকার করিয়া মিত্র-সাহেব কন্যাকে কহিলেন,—"শৈলর মাথায় কত ঝঞ্ঝাট, তুই ত তা নিজেই গল্প করলি। ভেবে দেখ্ দিখি মা, এতে চট্ ক'রে সে কি আস্‌তে পারে? আর এই দেরীটার জন্য আমরা যদি বাজে চিন্তা করি, তার ঘাড়ে যদি দোষ চাপাই, তা আমাদের অন্যায় হ'বে।"

সুলেখা কথা কহিল না। মুখও তুলিল না। পিতাকে এক কাপ চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, নিজের এক কাপ ঢালিয়া লইল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মিত্র-সাহেব অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। এতগুলা আশ্বাসবাণীতে সুলেখার মুখ

হইতে বিষাদের কালো মেঘখানা অপসৃত হইয়া আনন্দের দীপ্তি ফুটিল না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং ইহার জন্য মনে মনে মানুষের তরুণ বয়সটাকেই দায়ী করিলেন! ঐ একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অন্ধ আবেগে পরিচালিত অবস্থা মানুষের জীবনে একবার আসে, যখন মানুষ কাণে শোনে এক, অর্থ করে অপর। বিচার করে এক, ভাবে অন্য রকম। ঐ বিশ্রী বয়সটা অতিক্রম করিলে মানুষের যত রাগ আসিয়া পড়ে ওই অবস্থাটার উপর, এবং সাদা চুল ও কেশবিরল মাথায় তরুণ বয়সের নর-নারীর আচরণগুলা এত দৃষ্টিকটু, অসংযত, অন্যায় ঠেকে যে, প্রতিমুহূর্ত্তে ধৈর্য্যের বাঁধন টুটিয়া শাসন নিজেকে প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "শৈলকে আমি ভাল ক'রেই চিনি। সুকুমারের উপর আমার যতখানি না আস্থা আছে, তার চেয়ে আমার অনেকখানি বেশী আস্থা শৈলর উপর আছে। তোমার মনে এ-কথা জেগেছে ব'লে, লেখা, আমি দুঃখিত।"

ইঙ্গিতে এই অভিযোগটুকু করিয়া মিত্র-সাহেব কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। আশা করিয়াছিলেন, এবার একটা উত্তর তিনি পাইবেন। কিন্তু আশা করিলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে, ইহার ত কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। সুলেখা নীরবেই চা-পান করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইয়া গেল। বয় আসিয়া টেবল সাফ করিয়া দিল। তথাপি সুলেখা নির্ব্বাক্। মিত্র-সাহেব ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখা, তোমার কথার কি কোন কারণ আছে?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসটা সমুদ্রতরঙ্গের মত ফুলিয়া দুলিয়া তটের বুকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার আগ্রহে কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে প্রাণপণে রোধ করিতেই ওষ্ঠের কাঁপুনি দাঁত দিয়া চাপিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া সুলেখা চেয়ার ছাড়িয়া ঈষৎ ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

১৮

অনেকগুলি পুত্রকন্যার পিতা হইয়াও মিত্র-সাহেব দুইটি সন্তানকেই বুকে ধরিয়া বড় করিতে পারিয়াছিলেন। পুত্র সুকুমার, কন্যা সুলেখা। বাকি সকলেই কচি-মুখের মিষ্ট হাসিতে স্বল্প দিন মিত্র-সাহেবের বুকে আনন্দ দিয়া, আবার সেইখানেই কঠিন আঘাত করিয়া বিদায় লইয়াছে। সে প্রিয় মুখগুলির জন্য মিত্র-সাহেবের চোখে মতির বিন্দু গড়াইয়া পড়ে।

সুকুমার ছিল মিত্র-সাহেবের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পুরস্কার! সুলেখা তেমনই ছিল পত্নী-স্মৃতির শেষ নিদর্শন। সুলেখাকে একটি বৎসর পালন করিয়া তাহার মা সুজাতা, স্বামীর কাছে কন্যাকে গছাইয়া বক্ষঃছাড়া স্নেহ-নিধিগুলিকে খুঁজিতেই সাত দিনের জ্বরে অজানা রাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন।

জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী, আনন্দদায়িনী পত্নীকে হারাইয়া মিত্র-সাহেব তাঁহার শোকাহত জ্বালাভরা বুকে মা-হারা মেয়েকে টানিয়া লইয়াছিলেন। সে আজ অনেকগুলি বৎসর আগের কথা। তখন তাঁহার মাথাভরা কালো চুল, খোঁজা-খুঁজি করিলে দু'-চারি-গাছি সাদা মিলিত, এবং সন্নার দ্বারা মিত্র-সাহেব তাহা উৎখাতিত করিতেন। কিন্তু নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন বিধি-ব্যবস্থা চিরকাল টিকিয়া থাকে না। যুগ-হাওয়া তাহাকে বদল করিয়া দেয়। এখন

মিত্র-সাহেবের কেশবিরল মাথায় অবশিষ্ট কয়গাছি সাদা চুলকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যত্নের ত্রুটি নাই। অতীতে ইহারাই অনাদৃত ছিল।

সে-দিনে এ-দিনে অনেক তফাৎ। সে-দিন তিনি যে মা-হারাকে বুকে লইয়াছিলেন সান্ত্বনার জন্য, আজ শোকের আগুন নিবিয়াছে ; জ্বালাও নাই, শুধু পোড়ার দাগটাই আছে। কিন্তু আজ এমন নিবিড় করিয়া সারা বুক জুড়িয়া সেই মেয়ে আছে, যাহাতে মনে হয়, রূপকথার নায়ক-নায়িকার পরমায়ু যেমন নির্ভর করিত ফুলের মাঝে, পাখীর মাঝে, তেমনই মিত্র-সাহেবের পরমায়ুটুকু নির্ভর করে কন্যা সুলেখার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর উপর।

সুলেখা যখন দাঁত দিয়া ওষ্ঠাধর চাপিয়া বিবর্ণ মুখখানাকে পিতৃদৃষ্টি হইতে মুহূর্ত্তে সরাইয়া লইতে ত্বরিত পদে কক্ষ ছাড়িয়া গেল, তখন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি মিত্র-সাহেব নিজের চেয়ারখানাতে অচলায়তনের মত আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। দুঃস্বপ্নের মত কি হইল, কিছুই তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অসংখ্য চিন্তা সম্ভব-অসম্ভবের বেশ পরিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মিত্র-সাহেবের মগজটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এবং এই ভিড়ের মধ্য হইতে এই অপরিচিত দলের কাহাকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, মিথ্যা বলিয়া কাহাকে বা বিদায় দিবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে ক্ষণেক তিনি চাহিয়া রহিলেন। ভিতরের ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে, কতখানি মন্দের পথ ধরিয়াছে, প্রতিরোধ বা প্রতিকার কি, তাহাও মিত্র-সাহেব খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার কূটবুদ্ধি মামলার কাগজ হইতে আইনের অনেক গলদ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, প্রত্যুৎপন্নমতি কথার জালে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে

পারে, প্রতিভা-কৌশলে স্পষ্টলিখিত চুক্তিনামা হইতে স্বার্থকে বজায় করিতে স্বপক্ষে টানিয়া অর্থ-ব্যাখ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু নর-নারীর ভালবাসা-ব্যাপারে কোথা দিয়া যে কি ঘটিয়া যায়, জীবনের এই অপরাহ্নবেলায় তাহার কোন হদিস তিনি পাইলেন না।

মেয়েকে মিত্র-সাহেব ভাল করিয়াই চেনেন। সে যে মনগড়া খেয়ালে এতখানি করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই হইল না। তথাপি সুলেখার কথার মাঝে যে ইঙ্গিতটা ফুটিয়া উঠিতেছে, সেটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অন্তর সম্মত হয় না। শৈলর প্রতি মিত্র-সাহেবের গভীর বিশ্বাস আছে। শৈলর চরিত্রের দৃঢ়তা, অন্তরের উচ্চতার অনেক পরিচয় মিত্র-সাহেব পাইয়াছেন। মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধাও করেন, এবং শৈলর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কঠিন অধ্যবসায় এক দিন যে তাহাকে নিজ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে তুলিবে, ইহাতেও মিত্র-সাহেব নিশ্চিত ছিলেন। তাই শৈল যখন তাঁহার জামাতার পদ বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিল, সে-দিন তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং শৈলর হাতে যে তিনি মেয়েকে দিতে পারিবেন, ইহার গভীর আনন্দ, বর্ষার নদীর মত অন্তরের কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

মিত্র-সাহেব কথাটা বন্ধুকে জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। অসঙ্কোচে এই শুভবার্ত্তাটা ব্রজমোহনকে দিয়াছিলেন। শৈল সংসারে মাথা গলাইবে, ইহাতে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিমাত্রেই আন্তরিক সুখী হইবে; ইহা ছিল মিত্র-সাহেবের অকপট বিশ্বাস, এবং তাঁহার সুস্পষ্ট মনে আছে, ব্রজ আপত্তির কথা কিছুই বলে নাই; বরং অস্ফুটকণ্ঠে একটা আশীষ-বাণীই উচ্চারণ করিয়াছিল। তবে সমস্ত ব্যাপার এমন বিকৃত হইয়া যাইতেছে কেন?

মিত্র-সাহেব অকস্মাৎ স্থির করিলেন,—একটা অহেতুক কল্পনাকে স্বলেখা মনোরাজ্যে বিস্তার করিয়া যে অনর্থ করিতে উদ্যত, সেটার উৎপত্তি হইয়াছে শুধু শৈলর অনুপস্থিতির জন্য। সন্দেহের অঙ্কুর একবার হৃদয়ে রোপিত হইলে সে সবের মাঝ হইতে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেখিতে দেখিতে শাখা-পল্লবিত হইয়া উঠে, বিশ্বাসের স্বর্ণালোক আড়াল করিয়া অন্ধকার চিত্তের ভাল-মন্দ বুঝিবার দৃষ্টিটা হারাইয়া ফেলে।

নিজের বিগত যৌবনের কথা মিত্র-সাহেবের মনে পড়িল। বড় বড় মামলা লইয়া যখন তিনি বিদেশে ছুটিতেন এবং তাহার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়া পত্নীকে পত্র লিখিবার অবকাশ হারাইতেন, তখন স্বজাতা কতখানি রাগ করিয়া সম্ভব-অসম্ভব দোষে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে দোষী করিতেন, এবং বাদলের ধারা কেমন করিয়া সেই কালো চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িত—আর মিথ্যা-সৃষ্ট অপরাধ-অন্যায়গুলাকে ক্ষালন ও বিতাড়ন করিতে কত শপথের দ্বারা কতখানি বেগ পাইতে হইত, তাহা মনে পড়িতে লাগিল।

অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া, সুদীর্ঘ বিদ্যুৎরেখা যেমন ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য্যের মনোরম দীপ্তি আঁকিতে থাকে, তেমনই মিত্র-সাহেবের মনের বিমর্ষতার উপর লুপ্ত-যৌবনের বিস্মৃত অনেক কিছু স্মৃতি, কাহিনী বার বার খেলা করিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহারই আলো থাকিয়া-থাকিয়া মিত্র-সাহেবের আঁধার মুখখানাকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকের সন্দিগ্ধ-চিত্তের কথা মনে করিয়া মিত্র-সাহেবের হাসি পাইল। বিকলাঙ্গী রূপহীনা পিতৃ-মাতৃহারা মেয়েটির উপর কাহার না করুণার উদ্রেক হয়?

তাহার দুঃখের প্রতি মিত্র-সাহেবের অন্তরও সহানুভূতিতে ভরিয়া আছে। শৈল তাহার নিকট-আত্মীয়, তাহার জন্য শৈলর মন কাতর হওয়া স্বাভাবিক। স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করাও প্রধান কর্ত্তব্য। মিত্র-সাহেব নিজে ইহা স্বীকার করেন। শৈলর মত বিশ্বাসের অত-বড় উচ্চ স্থান আর আছে বলিয়া তিনি জানেন না। স্বলেখার অন্তর নীচ বা ক্ষুদ্র নহে। সে তাঁহারই কন্যা, তবে কেন সে এমন অবিচার করিল? মিত্র-সাহেব ক্ষুব্ধ হইলেন। নারী-প্রকৃতি বলিয়া চিত্তকে সান্ত্বনা দিলেন।

মানুষ নিজের চিন্তা অনুযায়ী অনেক সময়ে নিজের যুক্তিগুলিকে অজ্ঞাতে গুছাইয়া লয় এবং বিরোধী যুক্তিগুলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আত্মপক্ষকে সমর্থন করে। তাই অনেক সময়ে সত্য হইতে মানুষ বঞ্চিত হয়। ইহা চিরন্তন রীতি। কারণ, যুক্তি-তর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না বলিয়া যে, দুনিয়াতে অনেক কিছু মুছিয়া যাইবে, তাহা নহে।

মিত্র-সাহেব অনেক সমস্যার নিজেই মীমাংসা করিলেন। তিনি জানিতেও পারিলেন না, যে আকাশকে তিনি মেঘহীন পরিষ্কার বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহারই অদৃশ্য প্রান্তে একটা কালো মেঘ উদিত হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে সেটা সমস্ত আকাশেই পরিব্যাপ্ত হইবে। বুকে তাহার বজ্রও আছে।

১৯

পিতা-পুত্রীর সে-দিনকার সেই আলোচনার পর পনেরটা দিন কাটিয়া গেল। কেহ আর শৈলর সম্বন্ধে কোন কথা তুলে নাই। মিত্র-সাহেবও না। কিন্তু মুখে অনেক কথা না আসিলেও মনের ভিতর যে তাহার আলোচনা চলিবে না, তাহাও নহে। তাই মিত্র-সাহেবের মনের ভিতর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কিছু নয় বলিয়া তিনি যাহা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, সেই বিরক্তিকর চিন্তাই সময়ে-অসময়ে কাযে-অকাযে মনের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া যায়। ঘনপল্লব সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত করিলে তাহারই ফাটলে ফাটলে ঝিকিমিকি করিয়া আলোক-কণা নিজের স্থিতিটা জানাইয়া দেয়।

শৈলর নিকট হইতে মিত্র-সাহেব পত্র পাইলেন। তাহাতে জানিলেন, ব্রজমোহনের শ্রাদ্ধব্যাপার চুকিয়াছে, কিন্তু এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা সে চুকাইতে পারে নাই। তবে আশা করে, শীঘ্রই সকল কায সমাপ্ত করিয়া সে পাটনায় ফিরিবে।

শৈল সুলেখাকে পত্র লিখিয়াছিল। তাহাতে লিখিয়াছে, শ্বশুরের সেই অর্দ্ধসমাপ্ত দিনলিপিখানি এখন শৈলর কাছে আছে, এ-কথা সে অনিলাকে বলিয়াছে। কিন্তু সেই প্রহেলিকাময়ী মেয়েটি কোন কথার মাঝেই নিজেকে ধরা দিতে চাহে না। শৈল লিখিয়াছে, সে একটা ভয়ানক আশ্চর্য্যের বস্তু। চোখে না দেখিলে, পাশে না থাকিলে অনুভব

করা যায় না। নিজের চারি পাশে সে এমন একটা গণ্ডী সহজে রচনা করে, যাহাতে তাহার নিকট অগ্রসর হইবার মানুষের একটা সীমা সতত নির্দ্দিষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। নিকটতম শব্দের অর্থ বোধ করা অনিলার অভিধানে নাই। যদি থাকে, তাহার অর্থকেও সে স্বীকার করে না।

উত্তরে সুলেখা লিখিল, কঠিন-সাধ্যকে করায়ত্ত করায় আনন্দ আছে। যে ধরা দিতে চাহে না, ধরিবার আগ্রহ তাহার প্রতি বাড়িয়া থাকে। তাই মানুষ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অনায়াসে নিজের সব ছাড়িতে পারে। রাজ-ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কৌপীন পরিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, এবং ভগবান্‌কে যখন মানুষ পায় ইহা যেমন সত্য, তখন মানুষ যে মানুষকে পাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! তবে, পাইবার কামনা মন দিয়া না করিলে দুষ্প্রাপ্য কখন করায়ত্ত হয় না। আরও অনেক কথা দিয়া সুলেখা শৈলর পত্রখানা শেষ করিল। বুকের মাঝে ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আপনাকে সংযত করিল। নিজের হৃৎপিণ্ডকে দলিয়া এমন সর্ব্বনাশা কর্ত্তব্যের প্রেরণা শৈলকে দিবার তাহার প্রয়োজন কি? নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা উৎকট বোকামীর পরিচয় নহে কি?

হঠাৎ এক সময়ে সুলেখার লোভ হইল, চিঠিখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলে।

নিজের ব্যাকুলতাটুকুই সে শৈলকে জানাইবে। অপরের কথা জানিবার বাসনা অপূর্ণ থাকুক। কিন্তু—কিন্তু! শৈলর চোখে কি সুলেখা চিরদিনের মত নামিয়া যাইবে না? হয় ত তাহার আহ্বানে শৈল আসিবে। বন্ধন স্বীকার করিবে, বাগ্‌দত্ত নিরুপায় সে। কিন্তু সুলেখার অন্তর কি তাহাতে তৃপ্ত হইবে? সুলেখা চকিত হইল। ঝড়-বৃষ্টিভরা পৃথিবীর বুকের চেহারা আকাশের বিদ্যুৎ-অন্ধকারের পর্দ্দা

তুলিয়া নিমেষের জন্য যেন দেখাইয়া দিল। নিজের মনের দুর্ব্বলতার পানে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কোন্ মোহাবিষ্ট মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাছে এই সুদীর্ঘ পত্রখানা নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারই ভয়ে ভৃত্যকে ডাকিয়া সুলেখা তখনই উহা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

মনের ঝোঁকে অনেক কায করিলেও শরীরের ক্লান্তি নিস্তার দেয় না, নিজের নিয়মে আঁটিয়া বসে; তেমনই বিবেকের তাড়নায় অনেক কিছু ত্যাগ করিলেও ত্যাগের সুখ অব্যাহতি দেয় না। বর্ষার বর্ষণ-ধারার মাঝে সৃষ্টির কল্যাণ-বীজ নিহিত আছে জানা সত্ত্বেও সে যখন নৃত্যের ছন্দে কর্ম্মচক্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে—অপ্রীতির দৃষ্টি তখন আপনা হইতে তাহার উপর পতিত হয়।

সুলেখা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে হেলিয়া পড়িল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের চোখে দিনের আলোর রঙ যেন বদলাইয়া গেল! গোটা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে পৃথিবীকে এক চোখে দেখিয়াছিল; জীবনের অভিজ্ঞতা এমন পুঞ্জীভূত ও পুষ্ট হইয়া অভ্রভেদী হইয়া দাঁড়ায়—তাই। সুলেখা নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নিজের প্রকৃতির এই একটা দিক্ এত দিন তাহার আপনার কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পড়াশোনা, খেলা-গল্প, হাসি-ভালবাসার মাঝ দিয়া জীবনের কুড়িটা বৎসর তাহার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রান্তভাবে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল, চক্ষু মেলিয়া বিস্ময়ে দেখিল,—উচ্চে-নীচে, দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে, অসংখ্য কর্ম্মপ্রবাহ শুধু কাযের উদ্দামেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বিশ্ব যেন সহস্র বাহু মেলিয়া কাযের ইঙ্গিতই মানুষকে করিতেছে। পরার্থপরতার যজ্ঞকুণ্ডে বাসনার পুষ্পগুলিকে নিক্ষেপ করিয়া চিত্তকে তাহারই মাঝে

দিতে হইলে দুঃখের এমনিতর অগ্নি-পরীক্ষা মানুষকে দিতে হয়, এবং দিতে পারে বলিয়াই সে মানুষ। আঘাত না পাইলে ব্যক্তিকে চেনা যায় না ; দুঃসহ আঘাত দিয়া ভিতরের সুষুপ্ত মানুষটিকে জাগাইয়া তোলা বিশ্বস্রষ্টার একটা বিচিত্র খেয়াল ;

মিত্র-সাহেব জানিয়াছিলেন, সুলেখা শৈলর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে এবং তাহার উত্তরও দিয়াছে। বর্ষার শেষে শরতের আলোর মত, বিষণ্ণ অন্তর অকস্মাৎ ভিতরে ভিতরে পুলকিত হইয়া উঠিল। মনের দশখানা বাতায়ন খুলিয়া স্বস্তির বাতাস চিত্তকে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি দিতে চাহিল।

সুলেখার কক্ষে ঢুকিয়া হাসিমুখে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "লেখা! শৈলর চিঠির তুমি জবাব দিয়েছ?"

লিখিবার টেবলটা গুছাইতে গুছাইতে সুলেখা জানাইল, জবাব সে দিয়াছে!

মিত্র-সাহেব কৌচটার উপর বসিয়া কহিলেন, "শৈল শীগ্‌গির আসবে লিখেছে?"

তেমনই ভাবে কায করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই সংক্ষিপ্ত স্বরে সুলেখা কহিল,—"হাঁ"।

মিত্র-সাহেব কন্যার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কহিলেন, "লেখা, এ কাযগুলো থাক না, তোমার আয়া করবে। এসো, একটু গল্প করা যাক্।"

সুলেখা অপ্রতিভ হইল। হাতের ঝাড়নটা ফেলিয়া আসিয়া বসিল ; কহিল, "বাবা, দাদা এইবার ফিরবেন আমায় লিখেছেন। তোমায় বোধ হয়, তা লিখেছেন।"

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "ও-আশ্বাসটুকু সুকু আমাকেও ত দিয়েছে। কিন্তু অনেকবার নিরাশ হ'য়ে আমি আর ওটা বিশ্বাস করি না।"

সুলেখা কহিল, "না, না, দাদা নিশ্চিতই আস্‌বেন, আমাকে তিনি শপথ ক'রে লিখেছিলেন—এবার তাঁর কথার নড়-চড় হবে না।"

মিত্র-সাহেবের মুখের রেখার একটিরও পরিবর্ত্তন ঘটিল না; কহিলেন, "আসে ভাল; না এলেও ক্ষোভ করব না। শুধু অনুক্ষণ প্রার্থনা করব, তোমরা দু'টি ভাই-বোন আমার কাছে না দূরে যেখানেই থাক, সুখী হও—শান্তি পাও।"

মনের একটা গভীর বেদনা অজ্ঞাতে কণ্ঠস্বরে এমন নিবিড় হইয়া ধরা পড়িল যে, লেখা চকিত হইয়া জনকের মুখের পানে অপরাধীর মত একবার করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "তোমাদের বিয়ের কথা আমি সুকুমারকে লিখেছিলুম। সে জানিয়েছে, তার পূর্ব্বাহ্নে সে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকেও কি তাই লিখেছে?"

সুলেখার সুগৌর মুখখানা মুহূর্ত্তে একবার শোণিতলেশহীন হইল, আবার দেহের সমস্ত রক্ত যেন সেইখানেই নিমিষে আশ্রয় করিল। নিবিড় কালো চক্ষু দু'টি আষাঢ়ের নিকষকৃষ্ণ মেঘের মতই সজল বোধ হইল।

মেয়ের মুখের এই ভাবান্তরটুকু মিত্র-সাহেবের দৃষ্টিতে গোপন রহিল না। তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন। সংশয়ের বিদ্যুৎ এক লহমার জন্য দৃষ্টিকে বহু দূর বিস্তৃত করিয়া যাহা দেখাইয়া দিল, তাহাতে অন্তর তাঁহার যথার্থ-ই ভীত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি নিঃশব্দে রহিলেন। জগতে সন্তান ছাড়া বড় দুঃখ আর কেহ দিতে পারে না। মানুষ ইহার কাছে এমন করিয়া পরাভূত হয় যে, এমন করিয়া আর কাহারও কাছে কোন দিন সে নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে পারে না। তথাপি ইহাকে পাইবার জন্য কাঙ্গালবৃত্তির

সীমা-পরিসীমা থাকে না। অপত্যহারা জীবন যেন মরুভূমির মত শুধু ধু ধু করিয়া একটা বিরাট শূন্যতার কথা বলিতে থাকে। ব্যর্থতার হাহাকার আর মেটে না।

মিত্র-সাহেব কহিলেন,—"লেখা, ছোট-বেলায় তোমার মা তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন। আমিই তোমার বাপ-মা দুই হ'য়ে তোমায় বড় ক'রে তুলেছি। তোমার মা যে কথা শুন্‌তে পেতেন, আমি কি তা শোনবার দাবী ক'র্‌তে পারি না?"

সুলেখা কহিল,—"বাবা, তোমার কাছে তো আমার লুকাবার কিছু নেই। জ্যাঠামণি যে আশা বুকে নিয়ে—মিঃ রায়ের উচিত নয় কি তা পূর্ণ করা?"

মিত্র-সাহেব তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"হ্যাঁ, তা পূর্ণ করা উচিত আমি স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু আশা কিছু একটা করেছিলেন তার নিশ্চিত প্রমাণ কই? নিজেদের মন-গড়া একটা কিছু খাড়া কল্লে তো চল্‌বে না।"

সুলেখা মুখ নত করিয়া বসিয়াছিল। পিতার কণ্ঠস্বরে একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিল। স্বরে তাহার কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"না বাবা, এমন প্রমাণ আছে বা হয়ে গেছে, যা না বলা কোন মতেই চলে না। পাথরে ক্ষোদার মত এমন অক্ষয় প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন।"

সুলেখার কথাগুলি অগ্নিরেখার মত মিত্র-সাহেবের মাথার মধ্যে সশব্দে খেলিয়া তাঁহাকে একবারে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। মিনিট-খানেক পরে মিত্র-সাহেব কথা কহিলেন—তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের অস্ত ছিল না,—কহিলেন, "তার—ব্রজর আশাটা কি ছিল?"

সঙ্কোচহীনকণ্ঠে উত্তর হইল, "মিঃ রায়কে তাঁর জামাই করা। অনিলার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া।"

দ্রাবক-পূর্ণ বোমা ফাটিয়া নিকটস্থ জনকে ভীত করিয়া তোলার মত মিত্র-সাহেব ভীষণ চমকিয়া উঠিলেন ও কৌচটার উপর নড়িয়া বসিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "অসম্ভব মিথ্যা। কে এ আজগুবি রচনা করেছে? অবশ্য তুমি নয়!"

পিতার অন্তস্তলস্পর্শী, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে নিজের মুখখানা সরাইয়া না লইয়া অবিচলিত কণ্ঠে সুলেখা কহিল, "কারু মাথা হ'তে বার হয়-নি, বাবা! একটি মাত্র যাঁর মাথা হ'তে বার হবার অধিকার ছিল, সেই তিনিই বার ক'রে গেছেন।"

"এ কথা কে তোমাদের বললে? ব্রজর মুখ দিয়ে কখন এ-রকম কথা বার হবে না, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।"

প্রচণ্ড জ্বালায় মানুষ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। মিত্র-সাহেব কক্ষময় পাদ-চারণা আরম্ভ করিলেন।
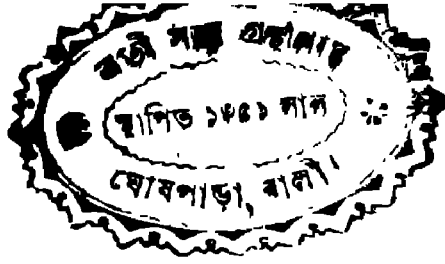
ধীরে ধীরে দিনের আলো নিজকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিল। যাহা স্পষ্ট ছিল, তাহা অস্পষ্ট হইয়া অবশেষে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বেহারা আসিয়া বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া কক্ষটাকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া গেল।

মিত্র-সাহেব চকিত হইলেন। মেয়ের পানে চাহিলেন। সুলেখা যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়াছে। ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত নিস্তব্ধ থাকিয়া সম্মুখের টেবলটার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু মুখ দেখিলেই বোঝা যায়—অকস্মাৎ টেবলটি এমন কিছু পরম বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে নাই যে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সুলেখা এমন নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বোধ করি, সে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে দৃষ্টির বাহিরে যাহা আছে, তাহাই দেখিতেছিল।

মিত্র-সাহেব কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "শৈলকে কি তুমি এই রকম নীচ মনে কর?"

সুলেখার মুখ পাংশু হইয়া গেল। দৃষ্টিতে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। কহিল,—"নীচ—না বাবা, আমি তো তা কোন দিন মনে করিনি!"

তীব্রকণ্ঠে পিতা কহিলেন,—"তবে এমন কথা তুমি কেন বললে, যাতে তাকে একটা ভয়ানক স্বার্থপর, কাপুরুষ বুঝায়? তার মুখ দেখ্‌তেও যেন ঘৃণা হয়?'

একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ভয়ের অন্ধকার—সুলেখার সুগৌর মুখখানিকে কালো করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত যেন সে রুদ্ধশ্বাস, রুদ্ধবাক্ পাথর হইয়া রহিল। তার পর কহিল,—কণ্ঠস্বর বাতাসে কাঁপা শতদলের মত একটা দুর্নিবার আতঙ্কে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে,—সুলেখা কহিল,—"না বাবা, তাঁকে একবারও ত আমি নীচ বা স্বার্থপর বলিনি।"

একটা প্রবল ক্রন্দনবেগ তাহার কণ্ঠস্বরকে রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

সুলেখার এই বেদনা-বিদ্ধ মুখখানার পানে চাহিয়া মিত্র-সাহেবের অন্তর উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিল, বুকের মাঝে কেবলই একটা দুর্দ্দমনীয় ক্রোধসমুদ্র তরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিযা যেন সংযমের সীমা ছাড়াইতে চাহে।

অন্তরের ছায়া চোখেই বেশী প্রতিফলিত হয়। মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি হইতে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ও, তুমি তা বল না। তুমি এখন ছেলেমানুষ কি না। কিন্তু আমি বলব, সে তাই। তার এই জুয়াচুরী আমি ভাঙ্গব।"

একটা প্রবল ধাক্কা যেন সুলেখার আচ্ছন্ন অন্তরকে ভয়ানক জোরে নাড়িয়া দিল। সর্ব্বনাশ যে কত বড় হাঁ মেলিয়া তাহাকে গিলিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত আলোকে তাহার ছবিটা সে দেখিতে পাইল। সে শিহরিয়া উঠিল। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "না, বাবা, না। সে জোচ্চোর নয়। মিথ্যাবাদীও নয়।"

ইহার বেশী কথা তাহার মুখে বাহির হইল না—বাহির হইল নেত্রে অশ্রু। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর মত হঠাৎ শাসনের বিধি-নিষেধকে চূর্ণ করিয়া উন্মত্ত আবেগে উহা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য যখন মানুষের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, স্নেহাস্পদের ব্যাকুলতা বা অশ্রুরেখায় অন্তর তখন বিচলিত হয় না। অন্তর ব্যথিত হইলেও কর্তব্যে বিমুখ হয় না।

আদেশপূর্ণ কণ্ঠে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "লেখা, তুমি তার ব্রীফ নিও না। আমি মানা কচ্ছি। ব্রজ যদি এ রকম প্রতিশ্রুতি তার কাছ থেকে নিয়েছিল, তবে কেন সেই মিথ্যাবাদী আমার কাছে তোমায় চাইলে? তাকে আমি সহজে নিষ্কৃতি দেব না।"

আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদৎগমের পূর্ব্বে সহসা যেমন বিবর্ণ হইয়া উঠে, ভয়ানক ক্রোধে মিত্র-সাহেব সেইরূপ পাণ্ডুর মুখে কার্পেটমোড়া মেজের উপর পা ঠুকিলেন।

শৈলর সহিত জনকের হয় ত একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিবে। তাহার লজ্জা, গ্লানি ও বেদনার বিষাক্ত বাষ্প নির্ম্মল বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করিয়া তুলিবে, তাহার ফলে তিল তিল করিয়া সুলেখাকে কি মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দিবে না? মানস-দৃষ্টিতে এই দৃশ্যের কল্পনা করিয়া, তাহার দেহ বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—পৌষের শীতাড়ষ্ট বাতাস যেন তাহার দেহের সমস্ত রক্তকে হিম-শীতল করিয়া দিল।

কম্পিত হাতখানা বাড়াইয়া সে পিতার হাতটা চাপিয়া ধরিল। যন্ত্রণামথিত কণ্ঠে সে কহিল, "না, বাবা, না। তুমি তা করো না। তুমি ঠাণ্ডা হও। গোড়া থেকে তার উপর অবিচার হচ্ছে। আমার মিনতি, তুমি তা করো না।"

মেয়ের চোখের অশ্রুবন্যা মিত্র-সাহেবকে এতক্ষণে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সুলেখার পাশে বসিয়া পড়িয়া তিনি কহিলেন, "না, তোমরা বল এক রকম, কর অন্য রকম। কিন্তু শৈল এমন লুকোচুরি

খেললে কেন? সে তো জান্‌ত যে—” কথা শেষ না করিয়া অর্দ্ধপথে মিত্র-সাহেব থামিলেন। বোধ করি, চরম দুঃখের কথাটা সহজে মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় না।

যে কথাটা উচ্চারিত হইল না, তাহার মাঝে যে কঠোরতম অভিযোগ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে চিনিতে সুলেখার এতটুকুও বিলম্ব হইল না। পিতার মত শান্ত কণ্ঠে সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “না বাবা, সে কিছু জান্‌ত না। আমি তাকে চিনি, সে প্রবঞ্চক নয়। যদি জ্যাঠামণির জীবিত অবস্থায় সামান্য ইঙ্গিতও তাঁর কাছ হ’তে সে পেত, তা হ’লে এমন প্রস্তাব সে কিছুতেই তুল্‌তে পারত না। বাবা, তুমি বিশ্বাস কর, আমি শপথ ক’রে বল্‌ছি, অনিলার অস্তিত্বও সে জান্‌ত না।”

মিত্র-সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। অবুঝ এই মেয়েটা! যুক্তি-তর্কের কোন অনুশাসনই এখানে চলে না এবং শৈলর প্রতি সুলেখার ভালবাসাটা সমুদ্রের মত কত গভীর ও সীমাহীন, তাহার পরিচয় মিত্র-সাহেবের অগোচর রহিল না। জীবনে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আর তাহার অন্তরে স্থান পাইবে না, নিঃসংশয়ে সেটুকু বুঝিয়া অন্তরটা তাঁহার ব্যথিত, পীড়িত হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে ফাটিয়া যাইবার মত যে বুকখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা জোড়া লাগিবে কেমন করিয়া? ভাঙ্গা জোড়া লাগিলেও নূতনের মত সে হয় না। জোড়ের একটুখানি দাগ চিরদিনের জন্য আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

আশাকে মানুষ ছাড়িতে পারে না, বাঁচিবার বীজ-মন্ত্র যে তাহারই মধ্যে নিহিত আছে। শৈলকে জামাতা করিবার কল্পনা মিত্র-সাহেবের সমগ্র অন্তর প্রভাবিত করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ চোখের সম্মুখে কল্পনা যেন ইন্দ্রধনুর মত মিলাইয়া গেল, তাহার স্থানে একটা দুঃখে-

পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মিত্র-সাহেবের চিত্তটা এই নিষ্ঠুর সত্যকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছিল না। আসন্ন মৃত্যুর পাশে দাঁড়াইয়াও মানুষ পথ খুঁজিতে থাকে, মনে করে, দৈব ইহাকে হয় ত রক্ষা করিবে।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "ব্রজকে আমি তোমাদের বিবাহের কথা জানিয়েছিলুম; কই, সে আমায় তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি?"

সুলেখা কহিল, "তিনি তো এ কথা কারও কাছেই বলেন-নি। পাটনায় এসেছিলেন, বল্‌তে পারেন-নি, সেইটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।"

মিত্র-সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বভাব কোমল, পরদুঃখকাতর অন্তঃকরণে কথাটা আঘাত করিল। কিন্তু তা বলিয়া প্রসঙ্গটার এইখানেই সমাপ্তি ঘটিল না। কহিলেন, "তুমি পাগল অনিলার কথা শুনে যত উদ্ভট চিন্তা, তোমার মাথায় শুধু জাগ্‌ছে। শৈল নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমায় কিছু বলেনি?"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া সুলেখা কহিল, "কিন্তু আমার কি আর তাকে বিবাহ করা উচিত?"

কন্যার মুখপানে ক্ষণকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অবশেষে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "কেন, উচিত নয়? তুমি ত নিজেই শৈলকে ছোট মনে কর না, অপরকেও কর্ত্তে দাও না। সে তোমাকে চেয়েছে। তুমিও তাতে অসন্তুষ্ট নও। তখন এ রকম পাগলামির খেয়াল মনে এনো না, লেখা! লোকে নিন্দা করবে।"

জনকের এই প্রকার বিরক্তিমাখা মূর্ত্তি সুলেখার অপরিজ্ঞাত। ঝড়ের আকাশের ন্যায় তাঁহার অন্ধকার মুখ সুলেখার দেহে একটা ভয়ের জাল বিস্তার করিলেও, মুখে একটা বেদনার চিহ্ন আঁকিলেও, যে

নির্ভীক নারীত্ব তাহার বুকের ভিতর অটল ছিল, তাহাকে যেন কিছুই স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। মূলহীন শৈবালদলের মত সবটাই যেন উপরে ভাসিতেছিল। মিত্র-সাহেবের যুক্তি, ক্রোধ, অনুনয় তাঁহার তূণের বাছা বাছা বাণগুলি সবই ব্যর্থ হইতেছিল।

সুলেখা শান্ত কণ্ঠে কহিল, "লোকে নিন্দা করবে, সেই দিক্‌টাই দেখ্‌ব? আর সমস্ত অন্তর যেটাকে অন্যায় বল্‌বে, সেইটা নিয়ে পীড়ন করব?"

বর্শার ফলার মত মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিক্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "পীড়ন! কথাগুলো তোমার ভয়ানক হেঁয়ালী-ভরা। শৈল কি তোমাকে বিবাহ কর্ত্তে সম্মত নয়?"

সুলেখা মাথা নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমরা দু'জনেই বুঝেছি এটা অনুচিত।"

বিদ্রূপের সুরে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "উচিত কোন্‌টা?"

সুলেখা কহিল, "জ্যাঠামণির ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করা। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন অনিলার সঙ্গেই তাঁর জামাইয়ের বিয়ে হবে।"

মিত্র-সাহেব ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহিলেন। বোধ করি, একটা উচ্ছ্বসিত ক্রোধকে ভিতরে দমন করিতেই তাঁহার এই নীরবতা। কিন্তু ক্রোধটা মেয়ের উপর হইল না। হইল সেই দুর্গ্রহের উপর, যে এই শান্তস্বভাবা, অনুগতা বুদ্ধিমতী মেয়েটাকে হঠাৎ এমন অবুঝ, অবাধ্য, বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট, অদৃষ্ট বলিয়াই তাহার উপরে আক্রোশের ঝাঁঝটা কণ্ঠ দিয়া সুলেখার উপর শ্লেষের সুরে বাহির হইল।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "তুমি বল্‌ছ, জীবনে এ-কথা ব্রজ মুখ দিয়া বার করেন-নি; তুমি বল্‌ছ, শৈল এ-সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পায়-নি।

অথচ ব্রজের এইটাই ইচ্ছা ছিল। মনের একান্ত কামনা ছিল। সুলেখা, তুমি নিজের কথায় নিজেই জড়িয়ে পড়ছ।"

মিত্র-সাহেব হাসিলেন।

এতটুকু বিচলিত না হইয়া সুলেখা কহিল, "তিনি যে নিজের জামাইকে নিজের ক'রেই রাখ্‌তে চেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ আছে। আর আমি তা দেখেছি।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মিত্র-সাহেব কহিলেন, "কই, কি অকাট্য প্রমাণ দেখাও আমাকে? তবে আমি তা বিশ্বাস করব।"

সুলেখা কহিল, "তাঁর নিজের হাতের লেখা আছে।"

মিত্র-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন, কহিলেন, "দেখি সে চিঠি।"

২১

প্রচণ্ড বিস্ময় ও তীব্রতম অভিমান ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইয়া, শৈলর অন্তরটা অনিলার প্রতি তিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। অনিলা তাহার অর্থের সাহায্য লইল না। তথাপি তাহারই পশ্চাতে অনুক্ষণ সাহায্যের বাহু বাড়াইয়া পদে পদে উপেক্ষিত হইতে হইবে? অকস্মাৎ সে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বসিল। আহত অন্তর ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর মত অনিলার প্রতি বিমুখতা করিতে ভিতরে ভিতরে তাহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইত। কিন্তু চেষ্টাই পাইত! তাহার উপর এক চুল সে উঠিতে পারিত না। বন্দী যেমন পরের ইচ্ছার উপর আপনাকে সমর্পিত করিয়া দুর্ভোগগুলা বহিতে থাকে, প্রতিকারের সমস্ত পন্থা রুদ্ধ, স্বাধীনতা-সূর্য্যের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি প্রবেশের কোনও উপায় পর্য্যন্ত নাই, শৈলরও ঠিক যেন তেমনই অবস্থা। একটা অজানিত মোহ অনির্দ্দিষ্ট পথে অসতর্কভাবে আসিয়া পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও গ্লানিকে পঙ্গু করিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণে অনিলার দিকে শৈলকে নিয়ত টানিতেছিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "বাবা, ও মেয়ের কথা ভগবান বুঝতে পারেন কি না জানি না। তুমি আমি তো মানুষ। তুমি যদি ওকে চাও, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? সাধে কি দুঃখ—"

শৈল কথাটাকে সমাপ্ত হইতে দিয়া কহিল, "আচ্ছা যাক্, আমি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা কহিব।"

জয়ন্তী সায় দিয়া কহিলেন, "তা তো ঠিক কথা শৈল। তুমি তো ছোট নও, সে-ও ছোট নয়। তোমরা পরস্পরকে বুঝবে ভাল। তবে কি জান, গেরস্থ ঘর, পাঁচ পরিবারের পরিবার, কথা না কয়ে তো থাক্‌তে পারি না।"—জয়ন্তী মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

শৈলর কপোল হইতে কর্ণমূল অবধি একবার আরক্ত হইল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। জয়ন্তীর মনটা সঙ্কীর্ণ, ছোট, তাহার অনেক পরিচয় শৈল পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্তরের নীচতা যে এতখানি, কোন বিষয়ে কটু ইঙ্গিত করিতে যে তাঁহার ওষ্ঠে বাধে না, তাহা শৈল পূর্ব্বে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। বৃশ্চিক-দংশনের মত একটা প্রচণ্ড জ্বালায় শৈলর মনের ভিতরটা জ্বলিতে লাগিল।

স্বার্থের কুজ্ঝটিকা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। জয়ন্তীর মন যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতম ইচ্ছায় নিরতিশয় বিকল না হইয়া স্বাভাবিক থাকিত, তাহা হইলে শৈলরই নীরবতা তাঁহাকে একটা কষাঘাত করিত, মুখের দীপ্তি নিভাইয়া অন্ধকার লেপিয়া দিত।

শৈলর মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া জয়ন্তীর চিত্ত বিকৃত ব্যথায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন, "জামাই বাবুকে খাওয়া; আমি দুধটা দেখে আসি।"—বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈল হাত গুটাইয়া উঠিতে উদ্যত হইতেই শুভা কহিল, "আপনি উঠ্‌ছেন কেন? মা যে আমাকে বক্‌বে!"

নীরস কণ্ঠে শৈল উত্তর করিল, "খাওয়া যে আমার হয়ে গেছে। তাই উঠ্‌ছি।"

"না! না! তা' উঠ্‌তে পাবেন না! মা চলে গেছেন বলেই আপনি উঠ্‌ছেন। আমি বুঝেছি।"

শুভা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভোরের আলোর মত সে হাসি নিজের ও পরের মনে আনন্দ সঞ্চার করিলেও, বিষাদের মেঘ সেই হাসির অন্তরালে যেন একটু কালো হইয়া ভাসিতে লাগিল।

শুভার মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "হাস্‌ছ!"

মানুষের মন যখন তিক্ত থাকে, সবই তখন তাহার কাছে অকারণে বিকৃত বলিয়া বোধ হয়।

শুভা কহিল, "আপনার রাগ দেখে না হেসে কি থাকা যায়! ঠিক যেন ছোট ছেলে, রাগ-গোসা হ'ল, আর গট্‌-গট্‌ করে উঠে গেল।"

সকালের আলো মুক্তধারায় যেমন অন্ধকারকে ধুইয়া দেয়, তেমনই অকপট চিত্তের সরলতা, বিষণ্ণতাটাকে স্বচ্ছ করিয়া তোলে। শৈল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, রাগ হয়েছে—কে প্রচার করলে?"

শুভা হাসিয়া কহিল, "প্রচারকের বুঝি অভাব হয়! আপনি নিজেই তো প্রচার কচ্ছেন।"

"আমি! হাঁ, এই মাত্র তোমার কাছে করলুম বুঝি?"

"করলেনই তো! মিথ্যা নাকি?"

বিদ্রূপভরে শৈল কহিল, "না, ভয়ানক সত্যি। আর এই রকম সত্যি আর একটু অগ্রসর হ'লে, এ বাড়ী থেকে আমাকে অনেকটা সরে যেতে হবে।"

শুভা হাসিয়া কহিল, "এটা আদালত-ঘর নয় যে, আপনি আইনের ফাঁকে সব এড়াবেন। এটা চোখের উপর—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "নিশ্চয় মানি। মিথ্যাটা শুধু তোমাদের চোখের খাতিরেই সত্যি হবার চেষ্টা করে।"

রহস্যের ছলে শৈল যে খোঁটা দিল, তাহা শুভাকে বিঁধিল। তাহার মুখের সরসশ্রী মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। আয়ত চোখে শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "মিথ্যা!—আচ্ছা আপনি ঠিক ক'রে বলুন, আমি ঘরে ঢুকতে আপনি খাওয়াটা চট্ ক'রে বন্ধ করলেন কিনা?"

শুভার চোখ দুটা চক্-চক্ করিয়া উঠিল।

নিজের আচরণ ঠিক সঙ্গত হয় নাই। মনের উষ্মাটা এই কিশোরীর চোখে গোপন রহে নাই, এবং নিজকে ইহার হেতু ভাবিয়া একটি কোমল চিত্ত যে ব্যথা পাইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া শৈলর পরদুঃখ-পীড়িত অন্তর অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের উপর বিমুখতায় তাহার চিত্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু কথাটা মনে হইতেই স্নেহে ও করুণায় তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্বভাব-বহির্ভূত একটুখানি হাসিয়া শৈল কহিল, "ইস, বয়ে গেছে। ওর ভয়ে আমি খাওয়া বন্ধ করতে গেলুম!"

জয়ন্তী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "শালিভগ্নীপতিতে তো খুব হাসি-খুসী গল্প জুড়ে দিয়েছ; ভাঁড়ার হ'তে শুনতে পাচ্ছিলুম। তাই অনিলাকে বললুম—শুভাটার আদর পাওয়ার কপাল। ঠাকুরপো ভালবাসতেন, শৈলও ভালবাসে।"

অতর্কিত চপেটাঘাত প্রাপ্তের মত এক নিমেষে শৈলর সুগৌর মুখখানা কাল হইয়া উঠিল। কোন কথা না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শুভা চেঁচাইয়া কহিল, "জামাই বাবু, আজ দুপুর বেলা আপনাকে তাস খেলতে হবে।"

শৈল কোন সাড়া না দিয়া সম্মুখের বারান্দাটা পার হইয়া যাইতেছিল, পার্শ্বের কক্ষের খোলা দরজা দিয়া তাহার অভ্যন্তরটা চোখে পড়িল ; দেখিল, অনিলা নত মুখে পান সাজিতেছে।

জয়ন্তী আর অনিলা সে-দিন পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছিলেন। জয়ন্তী একবার কক্ষের চারিপাশে চাহিয়া কহিলেন, "অনু, একটা কথা বলি মা, এখানে এখন কেউ নাই। এইবার কথাটা সেরেনি। ভুঁভাটা আছে শৈলর কাছে। তা' না হ'লে সে আবার এসে পড়বে।"

অনিলা মুখ তুলিল না। নিঃশব্দে যেমন খাইতেছিল, তেমনই খাইতে লাগিল। কিন্তু খাবার রুচিটা যে তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা থালার ও হাতের পানে চাহিলেই বুঝা যায়।

জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলর মনটা বড্ড নরম। চেপে-চুপে ধর্‌লে না বলে পারবে না। আমি ওকে তোর কথাই বল্‌ছিলুম, বল্‌লুম, বাবা—!" জয়ন্তী থামিলেন। মনে করিলেন, অনিলা এইবার তাহার ব্যগ্র-ব্যাকুল মুখ তুলিয়া চাহিবে, এবং সেই অবসরের ফাঁকে তিনি অনিলার মনের সব কথাটুকু আঁচিয়া লইবেন। নিজের কথার ধারাটাকে সেই অনুযায়ী গুছাইয়া লইবেন।

মানুষ আশা করে অনেকখানি, কিন্তু সফল হয় কতটুকু ?

বর্ষার নিঃশব্দ মেঘ-সঞ্চারের বুকে শক্তি থাকে অনন্ত। নির্ব্বাক সহিষ্ণুতা লইয়া প্রতিপক্ষকে অবহেলা দেখানটা পরাভবের লক্ষণ নহে জয়েরই পূর্ব্বাভাস।

জয়ন্তী কহিলেন, "অনু, মাছগুলা তো চট্‌কাচ্ছিস, খেলি কই ? অমন খাওয়া হ'লে শরীর থাকবে ক'দিন ?"

একটুখানি হাসিয়া অনিলা কহিল, "আপনি তো আমার খাওয়া জানেন না। আমি বরাবরই এমনি খাই।"

জয়ন্তী মনে মনে অবাক হইলেন। যে তুচ্ছ কথাটার উত্তর না দিলে কোন পক্ষেরই লাভ-ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই, অনিলা হাসি-মুখে সহজ কণ্ঠে সে কথাটার জবাব দিল। আর যে কথাটা জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়, যে সমস্যাটা উঁচু পাহাড়ের মত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার জন্য এই স্বল্প-ভাষিণী মেয়েটির নীরব নিথর বুকের মাঝে এতটুকু স্পন্দন যে জাগিয়াছে, তাহা সেই শান্ত রেখাপাতশূন্য মুখখানি দেখিয়া বুঝা গেল না।

কিন্তু এক পক্ষের নীরবতা যতই সুস্পষ্ট হউক, অন্য পক্ষের বলিবার স্পৃহাটা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না। জয়ন্তীর প্রকৃতিটা ছিল বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ, কঠিন; লক্ষ্যকে পূর্ণমাত্রায় বিদ্ধ না করিয়া সে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলকে বললুম, বাবা, তুমি ছাড়া ওর আর কে আছে? তুমি যদি ওকে দয়া কর, তবেই তো ও দাঁড়াতে পারবে। ওকে বিয়ে করাই তোমার ধর্ম্ম। অনিকে ভগবান্ যথার্থ ই করুণার পাত্রী করেছেন। 'ঠাকুরপোর উচিত ছিল, হাতে-পায়ে ধ'রে এ কায শেষ করা। তা আমরাই না হয় কচ্ছি।"

অনিলা মুখ তুলিয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা, আপনার খাওয়ার দেরী আছে?"

জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"না, মা, এই হ'ল বলে। একটু বোস না" বলিয়া দু-এক গ্রাস শেষ করিয়া কহিলেন, "জানিস অনু, শৈল একটা কথা কইতে পারলে না। কথায় বলে, ন্যায়ের দড়িতে হাতী বাঁধা পড়ে। তা তোকে একটু বলি মা, তুই তো ডাগর হয়েছিস। মা, জ্যাঠাই, আমরা শেখাব কি? তবে বলাও ভাল, সে সোমত্ত ও স্বাধীন ছেলে। বাধা দেবার কেউ নেই। তুই যদি একটু চেপে

ধরিস—এই একটু মমতা, যাকে আমরা চল্‌তি কথায় টান বলি, তাই একটু—”

কথাটা সমাপ্ত হইতে পাইল না। কাল মেঘ-ভরা বৈশাখের স্তব্ধ আকাশের মত সমস্ত মুখখানা জমাট গাম্ভীর্য্যে কঠিন হইয়া উঠিল। আসনের উপর দাঁড়াইয়া অনিলা কহিল, “আপনার খাওয়া শেষ হ’তে অনেক দেরী। অনুমতি নিয়ে উঠ্‌তে দোষ নেই, আমার কায আছে ; আমি চললুম।”

অনিলার মুখের পানে চাহিয়া জয়ন্তী আর একটুও শব্দ অবধি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন।

২২

শৈল শুভাকে দিয়া অনিলাকে বলিয়া পাঠাইল, সে দেখা করিবে।

হাতের সেলাইটা বাক্সের মধ্যে রাখিতে রাখিতে অনিলা কহিল, "আস্‌তে বল।"

শৈল কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল, "আমার একটু বিশেষ কথা আছে।" শুভার পানে চাহিয়া কহিল, "শুভা, এই আমার চাবিটা নাও। আমায় পাটনায় যেতে হবে। সুটকেশটা গুছিয়ে দাওগে।"

অনিচ্ছুক হাতে চাবিটা লইয়া শুভা একবার অনিলার পানে চাহিল। তার পর আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্তীর ঘৃণাকর ইঙ্গিতগুলা দপ্‌ করিয়া অনিলার মনে পড়িয়া গেল। মনের ভিতর অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে অন্তরটা কঠিন হইয়া উঠিল। ডাকিয়া কহিল, "শুভা, শুনে যা"—শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "সুটকেসটা গুছানর কি এক্ষুণি দরকার?"

শৈল এক মুহূর্ত্ত অনিলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর হাত বাড়াইয়া শুভাকে কহিল, "চাবিটা দাও, চাবিটা দাও। ওটা এখন গুছাতে হবে না। শুভা, তুমি একটু তোমার মার কাছে থাকগে। অনিলার সঙ্গে আমার একা কোন কথা আছে।"

শৈলর কথা বলিবার ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বর অনিলাকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্ষণকাল সে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দরজার পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া শুভা কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

শৈল চেয়ারটার উপর নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। শুভার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে অনিলার পানে চাহিয়া সে একটুখানি হাসিল, কহিল, "আমার এই রকম আচরণের জন্য এক্ষুণি একটা তুমুল আলোচনার ঝড় উঠ্‌বে জানি। কিন্তু আমি তাদের বোঝাতে চাই, আমারই শুধু এ রকম করবার অধিকার আছে।"

অনিলার সমস্ত মুখখানা পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উত্তর দিবার চেষ্টায় ওষ্ঠপ্রান্ত একটু কাঁপিল। কিন্তু কথা একটাও বাহির হইল না। অত্যন্ত অপরিচিত একটা লজ্জা অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে যেন আড়ষ্ট করিয়া তুলিল।

শৈল আস্তে আস্তে কহিল, "বাবার শ্রাদ্ধে তুমি আমার সাহায্য নিলে না, তখন তা নিয়ে জোর করিতে পারিনি। কেন না, জোর করবার অধিকার তখন তো পাইনি।"

বিদ্যুৎ-চমকের মত অনিলার মাথার ভিতর জয়ন্তীর সেই কথাগুলা খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত অন্তরটা দৃঢ় ও সতেজ হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "এখন কি সে অধিকার পেয়েছেন?"

অনিলার এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাটা শৈলর নিকট হঠাৎ ভয়ানক বিদ্রূপের মত বোধ হইল। গ্রীষ্মের তপ্ত বায়ু যেন মনের ভিতর একটা ঝটকা বহাইয়া গেল। ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, "অধিকারের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছ? তবে শোন, যে-দিন সুনীলা মারা গেল, তোমাদের

সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ ছিঁড়ে গেল; তার পর যে মুহূর্ত্তে তোমার বাবার টাকা আমার হাতে এল, এটা নিশ্চিত হয়ে গেল, তোমার আর আমার অদৃষ্ট এক সূতায় বাঁধ্‌তে হবে।"

অনিলা মুখ তুলিল। একটু সামান্য উদ্বেগের ছায়া বা বিস্ময়ের চিহ্ন তাহার নির্ব্বিকার মুখে বা শান্ত কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল না; কহিল, "বাবা টাকা দিয়ে আপনাকে বেঁধেছেন, তাই আপনার আর নিষ্কৃতি নাই? যত দুঃসাধ্যই হউক, আপনাকে তা পালন কর্ত্তে হবে?"

একটা খুব বড় রকম আত্মত্যাগ করিতেছে—তাহারই আনন্দের নেশায় শৈলর ভিতরটা মজগুল হইয়া উঠিয়াছিল। কল্পনার চোখে সকলের বিস্ময় ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সমক্ষে অনিলার সৌভাগ্য-দীপ্ত রাঙা মুখখানিও একবার দেখিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অনিলার শান্ত কণ্ঠের এই উত্তরটা আঘাত দিয়া যেন শৈলর তন্দ্রাটাকে ভাঙ্গিয়া দিল। ভয়ানক বিস্ময়ে সে অনিলার মুখের পানে চাহিল, এ-রকম জবাব যে অনিলার মুখ দিয়া বাহির হইবে, তাহা সে আশা করে নাই এবং বহুবারের মত আর একবার স্মরণ হইল, এই মেয়েটি দুর্ব্বোধ্য রহস্যের মত জটিল।

অনিলা কহিল, "কিন্তু তার কোন আবশ্যক নেই। আপনার মনের কাছে উঁচু থাক্‌তে পারেন, এইটুকু তাকে শুধু বোঝালেই হবে।" অনিলা একটু থামিল। পরমুহূর্ত্তে কহিল, "বাবা, দিদির সঙ্গে আপনার বিয়ে দিয়েছিলেন—সে-দিন সমস্ত অন্তর থেকেই আপনাকে বড় ক'রে তোল্‌বার ভার নিয়েছিলেন। এমন তো ভাবেন-নি, মেয়ে যদি না থাকে তবে কোরব না, সে-কথা তো বলেন-নি। প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আপনাকে মানুষ করবার, এবং নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা

করেছেন। তা ছাড়া আলাদা কিছু নেই। তবে এই দ্বিতীয় দধীচি হবার আবশ্যক আপনার কি ?”

অনিলার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ বা শ্লেষ কিছুই ছিল না। তথাপি সেটা গিয়া শৈলর বুকে বাজিল। যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়া এই যে প্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যান, ও তাহার মাঝে আরও প্রচ্ছন্ন যে তিরস্কারটুকু ছিল, সেটা যেন লজ্জার আকারে শৈলর মাথাটাকে হেঁট করিয়া দিতে চাহিল।

শুষ্ককণ্ঠে শৈল কহিল, “তিনি আমার উপকারক, তাঁর ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না।”

অনিলার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, “আমাদের চলবার পথে অনেক উপকারককেই তো আমরা দেখ্‌তে পাই, কিন্তু তাদের সকলের প্রত্যুপকার করবার চেষ্টায় অধীর হলে, দয়া ক'রে অনেকে আমাদের পাগলা-গারদেরই ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।”

শৈলর অন্তরের বিরক্তির পাত্রটা যেন উপচাইয়া পড়িল ; অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, “তুমি বলতে চাও, কৃতজ্ঞতা বিস্মরণ হওয়া মনুষ্যত্ব ?”

অন্ধকার আকাশের গায়ে বিদ্যুৎবিকাশের মত বিদ্রূপের কঠিন হাসিতে তাহার মুখ একবার ভরিয়া উঠিল ; কহিল, “দুঃখের বিষয়, সে নীতি-শিক্ষা কারুর থাকলেও আমার নেই। উপকারীর প্রত্যুপকার না করলেও জীবনটা—থাক সে কথা। তোমার মনের যেমন গঠন, কথাগুলো অসার উচ্ছ্বাসের মতই তোমার কাণে বাজ্‌বে। মনের খবর তুমি পাও না।”

অনিলা কহিল,—“আপনি দেনা শোধ করেন। যার কাছে এক তিল উপকার পান, ঠিক্ তিল মেপে যতক্ষণ তা শোধ করতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার মনের শান্তি, তৃপ্তি কিছুই নেই, এই তো ?”

অনিলা শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শৈল কহিল, "ঠিক তাই।"

শৈল যে উত্তরটা অতি সংক্ষেপে দিল, সেটা যে তীক্ষ্ণ তীরের মত গিয়া অপরের বুকে বিঁধিল, তাহা শৈলর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গেল। যে মেয়েটির পানে চাহিলে শৈলর বুকের ভিতরটা বেদনায় টন্-টন্ করিতে থাকে, স্নেহে করুণায় আর্ত্ত অন্তর সব সুখ, সব স্বার্থ ত্যাগ করিতে এতটুকু পশ্চাৎপদ হয় না, শৈলর সেই একান্ত সহানুভূতির পাত্রীর অন্তর যে তাহার মুখের ভাষায় আহত হইবে—তাহার বহু দিনের বহু রুদ্ধ বেদনাকে একেবারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে পারে, ইহার কোন সংবাদই শৈলর জানা ছিল না।

অনিলার মনের ভিতরটা পাথরের মত কঠিন হইয়া উঠিল। সহজ কণ্ঠে সে কহিল, "সতিকারের সাহায্য পাবার দাবী আপনার যেখানে ছিল, সেখানে সেটা দয়া বলে, প্রতিদান দেবার কথাটা জানিয়ে আপনি কৃতজ্ঞ অন্তরের মহত্ত্ব দেখিয়ে লোকের চমক লাগাতে চাইছেন। আর যেখানে পাবার দাবী ,আপনার এতটুকু ছিল না, তবু যে উপকৃত হয়েছেন, সে উপকারের দেনা আপনি কি দিয়ে শুধ্‌বেন? অথচ প্রত্যুপকার না করতে পেলে আপনার শান্তি নেই, তৃপ্তিও নেই।"

শৈল স্তব্ধ হইয়া গেল। অনিলা যে তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিবে, তাহা শৈলর স্বপ্নের অতীত ছিল।

আজ সকালে জয়ন্তী যে-ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, যে-ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহারই অপমানে, এবং শুভার সহিত অহেতুক হাস্যা-লাপের লজ্জায় সে নিজের অধিকারের দাবীটা অনিলার উপর সুস্পষ্ট করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে শুভাকে এমন অসঙ্কোচে কক্ষ হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। শৈলর মনের মাঝে আপনা হইতে

কেমন একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাহাকে চাহি না বলিয়া ফিরাইয়া দিবার সাধ্য অনিলার নাই। বরঞ্চ তাহার দুঃখের কপাল, রাতারাতির মধ্যে ভোজবাজির গল্পের মত সৌভাগ্যদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার গভীর আনন্দে নিঃশব্দে শ্রদ্ধার অঞ্জলি সে শৈলর প্রতি ঢালিয়া দিবে।

মানুষ যখন নিজের মন দিয়া অপরের বিচার করিতে থাকে, তখন তাহাকে এই ভাবেই ঠকিতে হয়। শৈলর মনে কর্তব্যের প্রেরণা ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল; কিন্তু অকস্মাৎ অভিনয়ের মাঝখানে যবনিকা পড়িয়া গেল। সবই যেন ভয়ানক খাপছাড়া বোধ হইল। দেওয়ালি নিশার আলোকমালা ঝড়ের ঝাপটায় এক সঙ্গে নিবিয়া গিয়া স্থানটাকে যেন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

শৈলর ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি, বিষণ্ণ দৃষ্টির পানে চাহিয়া—অনিলা কহিল, "আত্মীয়তার সামান্য বন্ধন না থাকলেও মিত্র-সাহেব যে আপনার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের ন্যায় আচরণ করেছিলেন, এর মধ্যে, কি একটা মস্ত বড় কামনা ছিল না? তাঁরই চেষ্টায়, যত্নে, আপনি পাটনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একটা প্রতিদান পাবার আশা কি তিনি রাখেন নাই? আর আপনি সেটা অনায়াসে দিতে পারেন। বাবার মুখে শুনেছিলুম, দেবার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছিলেন।"

অনিলার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও শৈলর গা জ্বলিয়া উঠিল; উত্তেজনার সহিত সে বলিল, "তখন তো জানতুম না, তুমি—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অনিলা কহিল, "আমি আছি? কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমি আছি বলেই কি আপনি আপনার উপকারকের প্রতি বিমুখ হবেন?—অসম্ভব! আপনি ঠিকই করেছিলেন।

এতে আপনার কুণ্ঠার কিছু নাই, লজ্জারও কিছু নাই। বরং এমনই তো হচ্ছে।”

সবিস্ময়ে শৈল কহিল, “এমন তো হচ্ছে!”

“নিশ্চয় হচ্ছে। সকলেই আপনাদের বাক্‌দানের কথা জেনেছে। মিত্র-সাহেব সানন্দে আপনাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মেয়ে, তিনিও তো মনে মনে আপনাকে স্বামী বলে বরণ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ যখন সে সব মিথ্যা হয়ে যাবে, তখন বাইরে আপনার নিন্দাটা কি ভয়ানক হয়ে উঠ্‌বে, একবার চিন্তা করুন। আর সুলেখার কথা ভাবুন, যে কোন অংশে আপনার অযোগ্য নয়—আপনার প্রার্থিত—তার উপর কি ভয়ানক অন্যায় করা হ'বে বলুন। এই আশাভঙ্গের বেদনা সে যদি না সইতে পারে! বাপের চোখের মণি সে হয়ে আছে। জানেন তো, সংসারে বড্ড প্রয়োজন যাকে—থাকা তারই দুঃসাধ্য। তা' হ'লে আপনার সেই একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর আপনি কি ক'র্‌লেন?”

শৈল আর একটি কথাও কহিতে পারিল না। দুই চোখের দৃষ্টিতে শুধু একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। অনিলার কথাগুলা অসঙ্গত নহে, অন্যায় নহে। অজানার আড়ালে সংগুপ্ত ভবিষ্যতের চেহারা কে-ই বা দেখিতে পায়? তাহার মন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। শ্বশুরের মৃত্যুর পরই একটা দুঃসহ চিন্তা কুয়াসা-ঢাকা প্রভাতের মত তাহার সমস্ত মনটাকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল; মধ্যে শুধু একটা ভয়ানক ত্যাগ করিতেছে। আনন্দে তাহারই আলোর আভাস সে দেখিতে পাইতেছিল। আবার সবই যেন মিলাইয়া গেল। চোখে পড়িল মেঘান্ধকার সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ।

২৩

শৈল যে-দিন পাটনা হইতে ব্রজমোহনের সেই হারান বাক্সটা লইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার একান্ত বিরস মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি ও ম্রিয়মাণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল, এবং দ্বিধাহীন ভাবে অনুমান করিয়া লইয়াছিল, এটা দীর্ঘ পথশ্রমজনিত ক্লান্তি।

নিজের ঘরে অনিলাও সে-দিন শৈলকে জল খাওয়াইতে বসাইয়া সকলের মতই চমকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পাঁচ জনের মত মুখে সেটা প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই শৈলকে সে কোন প্রশ্নই করে নাই, এবং পাঁচ জনে যে কারণটা অবিলম্বে ধারণা করিয়া সন্তুষ্ট হইল, সেটার সহিত তাহার মতের সামঞ্জস্য রহিল না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি শুধু তাহার প্রখর হইয়া উঠিল। শ্রমের ক্লান্তি এমন করিয়া মানুষের মুখে কাল দাগ টানিতে পারে না, তাহা বুঝিয়া অনিলা নিজের মনেই ইহার কারণ খুঁজিতে লাগিল। অর্থব্যয়ের দুর্ভাবনা কি শৈলর মনে এমন করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, যাহার ভারে সে ক্লান্ত, অবসন্ন? অনিলা সঙ্কল্প করিল, সেই দুর্ভাবনা হইতে শৈলকে সে মুক্তি দিবে। কিন্তু সেই তর্কে যে-দিন শৈল নিজের বুক-পকেট হইতে ব্রজমোহনের সেই অসমাপ্ত খাতাখানা অনিলার সম্মুখে বাহির করিয়া জানাইয়া দিল, শৈলর অনিলার উপর দাবী কতখানি, এবং কৃতজ্ঞতার নাগপাশে শ্বশুর তাহাকে যে বন্ধন দিয়া গিয়াছেন, তাহা খুলিবার সাধ্য তাহার নাই—অনিলারও নাই।

শোণিতলেশহীন শবের মুখ লইয়া অনিলা শৈলর মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়াছিল, এবং শৈলর মহত্ত্বটা যতই বুকের মাঝে অনুভব করিতেছিল, ততই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার সারা অন্তর আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য ক্ষোভে লজ্জায় ভিতরটা তাহার সমধিক ব্যাকুল হইতেছিল। স্বর্গবাসী পিতার অমোঘ ইচ্ছা কি ভয়ানকভাবে সুলেখার কাছ হইতে শৈলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দিকে টানিয়া আনিতেছে, তাহা মনে হইতেই অন্তরটা তাহার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু—না, অনিলা এত বড নিষ্ঠুরা নয়। এমন করিয়া নিজের সুখ-কামনা সে করে না। তাহার পিতার অনেক অর্থ অনেক দিকেই ব্যয়িত হইয়াছে, শৈলর জন্যও না হয় কিছু হইয়াছে। কিন্তু গ্রহণেরও ত অধিকারভেদ আছে, সে তাহার দিদির স্বামী।

নিরালা কক্ষে একলা বসিয়া শৈলর সহিত বাদানুবাদগুলা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আকস্মিক একটা গভীরতর লজ্জায় অনিলা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

শৈলকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া অনিলার অন্তরে একটা অনুতাপ জাগিতেছিল। তাহাকে যে শৈল বুদ্ধিহীনা গর্ব্বিতা বলিয়াই মনে মনে অভিহিত করিবে, ইহা ভাবিতে তরুণীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল। মানুষের চোখে ছোট হইয়া যাওয়ার অপেক্ষা বড় লজ্জা আর নাই। কিন্তু রূপ-হীনা অঙ্গহীনা যে, তাহাকে পত্নী করিয়া কেহ কি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? পুরুষের যৌবন-স্ফীত চিত্তের তলে তলে অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক মোহ যে জড়ান থাকে। অতৃপ্তির বোঝা মানুষ কত দিন বহিতে পারে? সমুদ্রমন্থনে অনন্ত নাগের ক্লান্তির নিশ্বাসের মত অতৃপ্ত দাম্পত্য জীবনের ক্লান্তি মুহুর্মুহু যে বিষ উদ্গিরণ করে, তাহাতে সংসারটা

দু'দিনেই তিক্ত, বিস্বাদ হয়। নর-নারীর আয়ু তিলে তিলে হরণ করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়।

অনিলার অন্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, শৈলকে সে মুক্তি দিবে। কিন্তু কেন সে শৈলকে মুক্তি দিতেছে, তাহার অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিতও কোন দিন সে শৈলকে জানিতে দিবে না। শৈলর যতটুকু পরিচয় অনিলা পাইয়াছিল, সুখে, দুঃখে অনিলার নিঃসংশয় সঙ্কোচহীন নির্ভর-স্থল হইয়া দাঁড়াইতে সে যখন, বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তখন 'যাও' বলিলেই সে চলিয়া যাইবে না,—যাওয়ার অকাট্য যুক্তিটা যতক্ষণ না তাহার বিবেকের সহিত খাপ খাইবে।

অনিলা ভাবিতেছিল, নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেই কি তাহা গ্রহণ করা যায়? গ্রহণেরও ত একটা যোগ্যতা, একটা সীমা আছে। আধারের তুলনায় আধেয়টা বেশী হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। মনের এমনই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে, সংযত কর্ত্তব্যময়ী নারীমূর্ত্তির অনুশাসনের তলায়, যে তরুণী কুমারীর প্রাণটি নিঃশব্দে বসিয়াছিল, বেদনার আঘাতে সে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহারই অফুরন্ত চোখের জলে অনিলার দুই গণ্ড প্লাবিত হইয়া গেল।

অজ্ঞাতে সে যে শৈলকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল,—তাহারই গোপন-সংবাদ বুকের ভিতর হইতে অকস্মাৎ কে যেন অনিলার কাণে কাণে বলিয়া দিল। অনতিক্রমণীয় বাধার রুদ্ধ কপাটখানার উপর প্রণয়ের নিষ্ফল মর্ম্মবেদনা প্রতিহত হইতে লাগিল। তাহারই বেদনায় অধীর হইয়া সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ভগবান্! ভগবান্! এক দিন তো তুমি সবই দিয়াছিলে, দেবতা! তবে কেন যৌবনের প্রবেশ-পথে তাহাকে এমন করিয়া ভিখারী করিয়া দিলে?

জন্মান্তরের কোন্ কঠিন অপরাধের দণ্ড নির্ম্মম হাতে অনিলার মাথায় হানিয়া বসিলে? চোখের জলে ভাসিয়া অনিলা প্রার্থনা করিল, যে ক্ষমাহীন শাস্তি আমার মাথার উপর দিয়াছ দেবতা, সে বোঝাটা বহিবার শক্তি দাও তুমি, শক্তিময়! ভালবাসার অমূর্ত্ত বিন্দুপানের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় চাঁদের পাশে ঘুরিবার মত আকাঙ্ক্ষা কোন দিন যেন তাহার প্রাণে না জাগে।

এমন করিয়া অনিলার তরুণী-বুকের ভালবাসার সহিত বিবেকের একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। ভোগের সহিত ত্যাগের কুরুক্ষেত্র-সমর যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে জয়ন্তী ধীরে ধীরে অনিলার কাণে ঢালিয়া দিলেন, শুভার প্রতি শৈলর স্নেহ কতখানি প্রবল হইয়াছে। মন্তব্যে প্রকাশ পাইল, ইহা স্বাভাবিক। ইঙ্গিতে তিনি জানাইলেন, অনিলার উচিত, শৈলকে আকর্ষণ করা।

রৌদ্রের উত্তাপের তুলনায় রৌদ্রতপ্ত বালির বেশী জ্বালা; দুঃখের অপেক্ষা দুঃখের কৃত্রিম সহানুভূতিটা বেশী অসহনীয়। অনিলার বুকের ভিতরটা দগ্ধ অঙ্গারের পোড়ার মত রি-রি করিতে লাগিল। অদৃষ্টের দোষ দিয়া জয়ন্তী জানাইয়া দিলেন, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শৈল অনিলাকে গ্রহণ করিলেও পুরুষের রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্যভরা তনু-মন আপনার অজ্ঞাতে অপরকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। অনিলা জয়ন্তীর এই সকল ইঙ্গিত ও মন্তব্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না। শুধু তাহার দুঃখসমুদ্র মথিত করিয়া এই চিন্তাটাই বার বার জাগিতে লাগিল, অনিলা যদি শৈলর সহধর্ম্মিণী হয়, তাহা হইলে শৈলর উপর একটা কঠিন অবিচার করা হইবে। শৈলর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুব্ধ পীড়িত অন্তরের ব্যথা অভিযোগের মত অন্তর্য্যামীর পাদমূলে নিপতিত হইয়া, হয় তো তাহার স্বর্গবাসী পিতার অনাবিল

শান্তির হানি ঘটাইবে। ভালবাসার ধনকে যূপকাষ্ঠে নীত জীবের মত কেহ কি বলি দিতে পারে?

নিজের অন্তরকে দৃঢ় করিতে অনিলা বদ্ধপরিকর হইল। হঠাৎ অনিলার মনে হইল, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবে বলিয়া শৈল সুলেখাকে ছাড়িয়া আসিয়া আবার অজ্ঞাতে হয় তো শুভার প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। না, না, সুলেখার কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শৈলকে শুভার হইতে অনিলা কোন মতে দিতে পারিবে না।

২৪
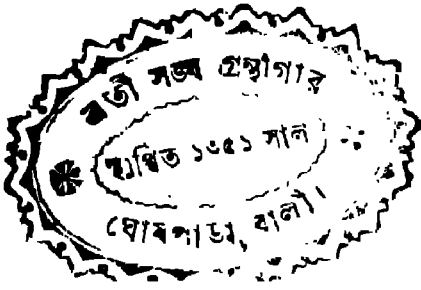
পত্নীর পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "অনিলার দুর্ব্বুদ্ধি শুনেছ? বিয়ে সে করবে না।"

একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলকেও নয়?"

বিরজামোহন কহিলেন, "তবে ছাই বল্‌ছি কি? তাকে বিয়ে করবার জন্যে শৈল ভিন্ন এ পৃথিবীতে ব্যস্ত হওয়া তো দূরের কথা, সম্মতিই বা দেবে কে?"

জয়ন্তী পাণের সহিত খানিকটা দোক্তা মুখে পুরিয়া দিয়া মুখখানা ফুটবলের মত স্ফীত করিয়া কহিলেন, "কেন কচ্ছে না? শৈলকে কি পছন্দ হ'লো না?"

তপ্ত কড়ায় খই ফুটিয়া-উঠার মত বিরজামোহন হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "পছন্দ? ওর জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার জোর! শৈল যে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে শুধু ব্রজর খাতিরে। হ্যাঁ, মানুষ তো এই শৈলকেই বলি।"

প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত জয়ন্তী কহিলেন, "তবে ভাইঝি বা তা চিনলেন না কেন?"

উষ্মার সহিত বিরজামোহন কহিলেন, "বরাতের লেখা।"

ভিতরের ক্রোধটা জয়ন্তী আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উত্তাপের সহিত কহিলেন, "নিজের বরাতের লেখা কিছু পড়েছো! পরের বরাতের কথা ভেবে তো খুব আকুল হচ্ছ!"

বিনা কলহে অকস্মাৎ একটা চড় খাইয়া মানুষ যেমন থতমত খাইয়া যায়, তেমনই সবিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "তোমার কথার হেঁয়ালী বোঝা দায়! যা কপালে আছে হবে, তার জন্য চিন্তা করব কি?"

জয়ন্তীর ভিতরে যেন অগ্নিকাণ্ড বাধিয়া গেল, দীপ্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ, বরাত মানুষকে গড়ে নিতে হবে। সত্যি সত্যি গোঁপের তলায় খেজুর আসে না। হাতের কাছে সে থাকে, হাত দিয়েই তাকে গোঁপের তলায় দিতে হয়।"

বিরজামোহন কহিলেন, "কিন্তু বর্ত্তমানে খেজুর পাই বা কোথা? হাতই বা দিই কোথা?"

—"চোখ আর ইচ্ছা থাকলেই হয়। এই যে আমি কচ্ছি কি ক'রে? এই যে অনিলার হেথা পড়ে আছি, মায়ের মত তাকে শেখাচ্ছি পড়াচ্ছি, এ কেন? ভেবে দেখেছ কি?"

একটুও দ্বিধা না করিয়া বিরজামোহন কহিলেন,—"নিশ্চয় দেখেছি। ওর মা-বাপ নেই, তাই।"

"নেই তো আমার কি?" বলিয়া স্বামীর প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জয়ন্তী মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন।

বিরজামোহন মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। পত্নী এক দিন বলিয়াছিলেন, "এখন আমরা ছাড়া অনিলার আর কে আছে? তার কাছে আমাদের থাকা উচিত।" বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়াছিলেন। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে পুত্র-কন্যা লইয়া বিরজামোহন অনিলার বাড়ীর ছাতের তলায় আশ্রয় লইয়া শিকড় গাড়িতেছিলেন। কিন্তু আজ অকস্মাৎ পত্নীর এই বিপরীত সুরটা তাঁহাকে বুদ্ধিভ্রান্ত করিয়া দিল। এলো সূতার রাশি বাতাসে জড়ো হইয়া জট-পাকানোর মত সব কিছুই

গুলাইয়া গেল। পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "তবে কি এখানে থাকবার প্রয়োজন আমাদের নাই ?"

বুদ্ধিমান্ শত্রুর সহিত বিবাদ করিয়াও সুখ আছে; নির্ব্বুদ্ধি মিত্রের সহিত বন্ধুত্বেও তৃপ্তি নাই। জয়ন্তী ঝাঁকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তোমার মত জেগে ঘুমোলে থাকবার দরকার নেই। অনিলা বিয়েতে মত দিচ্ছে না ব'লে কেঁদে হাট বসাচ্ছ, কিন্তু কেন দিচ্ছে না, খোঁজ করেছ ?"

মহা বিস্ময়ে বিরজামোহন কহিলেন, "কেন দিচ্ছে না ?"

বিজয়-হাস্যে জয়ন্তীর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উল্লসিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "যতই তারা সেয়ানা হোক, আমার কাছে উড়তে দেরী আছে। আমি শৈলকে বলছি, বিয়ে করা তার উচিত। অনিলাকে জানাচ্ছি, বিয়েটা যদি হয় তার সৌভাগ্য। কিন্তু তার মাঝে কল-কাঠীটি এমনি ভাবে টিপ্ছি যে, নিজেরাই দু'দিকে দু'জনে সরে যাচ্ছে।"

এই একান্ত নীচ স্বার্থপরতার চিত্র দুঃস্বপ্নের মত বিরজামোহনকে কয়েক মুহূর্ত্ত ভীত করিয়া রাখিল। পত্নীর পানে একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ছিঃ, তুমি না মা ? তোমার না মেয়ে আছে ?"

স্বামীর মুখের এই এত বড় তিরস্কারে জয়ন্তীর মুখের এতটুকু রং বদলাইল না। ভিতরে যে তিনি লজ্জা পাইয়াছেন, তাহারও চিহ্ন দেখা দিল না। সঙ্কোচহীন কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তোমার মত নিরেট দায়িত্বজ্ঞানহীন হ'লেই মুখ দিয়ে এমন কথা বার হয়।"

বিস্ময়ে বিরক্তিতে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "স্বার্থ মানুষের ভাল-মন্দ দৃষ্টিটাকে নষ্ট ক'রে দেয়। তুমি

আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছ; আমি বল্‌ছি, নিজের সংসারের যদি কল্যাণ পেতে চাও, পরের মাথা খেতে যেও না।"

জয়ন্তী জ্বলিয়া উঠিলেন, তেমনই উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কারু মাথা খেতে চাই না। আমি আমার ছেলে-মেয়ের কল্যাণ খুঁজ্‌ছি—যা প্রত্যেক বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য। আমি তার চেয়ে এক চুল বেশী কিছু খুঁজি না।"

বিরজামোহন অবাক্ হইয়া গেলেন। পত্নীর মুখ লজ্জায় ম্লান না হইয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল—দায়িত্বের গরিমা-বোধে।

জয়ন্তী কহিলেন, "অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, মা-বাপ যদি সন্তানের শুভ চেষ্টা না করে তো তাকে নরকে পচ্‌তে হয়। তুমি আমাকে স্বার্থপর ব'লে গাল দিচ্ছ, তোমার ভাই কি স্বার্থপর ছিল না? তবে কেন তার সুখ্যাতিতে গলা ফাটাচ্ছ?"

বিরজামোহন রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমার ভাই স্বার্থপর ছিল? কি বলছ তুমি?"

তৎক্ষণাৎ হাত-মুখ নাড়িয়া জয়ন্তী উত্তর দিলেন, "না, পরার্থপরতায় দধীচি! নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে সে কি করেনি? জালের পর জাল বিছিয়ে শৈলকে এমন ক'রে সে বেঁধে গেছে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া শৈলর অসাধ্য। যে মেয়েকে চোখে দেখ্‌লে কেউ বউ করে না, তাকেই বিয়ে করবার জন্য শৈল ব্যস্ত! তোমার ভাই জান্‌ত, এ কাযটা করা অন্যায়। তাই মুখ ফুটে কোন দিন বল্‌তে পারেনি,—'শৈল, তুমি আমার মেয়েকে নাও।' কিন্তু এক টুকরা কাগজে এমন দলিল ক'রে গেল, যা ফেল্‌তে শৈল কিছুতেই পাচ্ছে না।"

বিরজামোহন নির্ব্বাক্ রহিলেন। তাঁহার অপলক দৃষ্টি পত্নীর মুখের প্রতি স্থির হইয়া রহিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "তুমিই বল, শৈলর কি নেই ? রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ঐশ্বর্য্য আন্‌বার শক্তি—সবই তার আছে। ভাগ্যমানী মেয়েরাই শৈলকে পেলে ধন্য হয়। তোমার ভাইয়ের স্বধু নিজের টাকা ছিল ব'লে কাণা কুচ্ছিত মেয়েটার জন্য তাকে বেঁধে রেখে গেছে, এতে পাপ হয় না ? এ রকম বিয়ে শৈলর জীবনে শুভ হবে কি ? একটা মানুষের সারা জীবনের তৃপ্তি হরণ করার চেয়ে পাপ আর কি আছে ? তবু এ কাযে তার পাপ হয়নি, কেন জান ?"

জয়ন্তী উজ্জ্বল নেত্রতারকা উর্দ্ধে তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিলেন।

সাপের দৃষ্টিতে মোহাকৃষ্ট পতঙ্গের মত পত্নীর উজ্জ্বল চোখের পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বিরজামোহন কহিলেন, "কেন ?"

জয়ের আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ মানুষের আর কিছু নাই। অন্তরের গভীর উল্লাস জয়ন্তীর মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সোৎসাহে তিনি কহিলেন, "এই এতখানি করার পিছনে, ইচ্ছাটা ছিল তার মেয়ের মঙ্গল করা। ভগবান্ তার ইচ্ছাটা দেখেছেন, তিনি নিজে যাকে দুঃখী করেছেন, বাপের প্রাণ তাকে সুখী করতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করেনি। তাই ঠাকুরপোর স্বর্গবাসের বাধা জন্মাবে না। আমিও তেমনি কোন পাপ কচ্ছি না।"

যুক্তি-তর্ক বাদ-বিতণ্ডায় জয়ী হইতে না পারিলেও সেই মতটা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিরজামোহনের চিত্ত কিছুতেই সম্মত হইতেছিল না। কুণ্ঠিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ব্রজর এত আশার জিনিস এমন হ'লে পাপ শব্দটার কোন অর্থ-ই থাকে না।"

জয়ন্তী হাসিলেন, কহিলেন, "ভ্রান্ত সংস্কারকে আঁকড়ে তুমি থাক, পাপ-পুণ্যির একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মানুষকে হত্যা করলে ভয়ানক পাপ বল ? কিন্তু যুদ্ধে যখন বিপক্ষকে মারা হয়, তখন হয়

অক্ষয় পুণ্য। কেন, সে মৃত্যুটা কি মৃত্যু নয়? তাতে কি ব্যথা বাজে না? কিন্তু ক্ষেত্রহিসাবে বিচার হচ্ছে বলেই পাপ পুণ্যে পরিণত হলো। তেমনি বুদ্ধি দিয়ে পারি, অর্থ দিয়ে পারি, আর সামর্থ্য দিয়ে পারি, সন্তানকে যদি বড় করবার চেষ্টা না করি তো সেই আমাদের মহাপাপ।"

বিরজামোহন কহিলেন, "কিন্তু এর মাঝে পরস্বহরণ ছাড়া বড় হবার আর কি পাচ্ছ বল?"

"পাচ্ছি না? আমাদের এমন টাকা নেই—যাতে শৈলর মত জামাই আমরা কখন পাব; শুধু একটু বুদ্ধি খরচ করলেই যদি তাকে পাই, তবে কেন করব না? ভাল জিনিসটাকে প্রত্যেকেই চায়। যার শক্তি আছে, সে কেড়ে নেয়। এ শুধু শক্তির পরিচয় প্রদান। আমার মেয়ের ভাল আমি সকলের চেয়ে বেশী ক'রে চাইব। তার জন্যে যা দরকার সবই আমি করব। তাতে পাপ নেই। আমি মা, আমার তা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

বিরজামোহন দুর্ব্বলপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পত্নীর সহিত বাদ-বিতণ্ডায় পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু বাহিরের শাসনে অন্তর বশীভূত হয় না। নিরন্তর সে প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মানুষ ইচ্ছা করিলে মানুষের ভাল করিতে পারে না, ভগবান্ যদি সহায়তা না করেন।

২৫

সুকুমার পিতার পানে চাহিয়া কহিল,—"বাবা আমি বিলেতে থাক্‌তে যা জানতে পারতুম, এখানে দেখ্‌ছি তার সব বিপরীত।"

মিত্র-সাহেব কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "তখন যা জেনেছিলে তাও সত্যি, এখন যা জান্‌ছ এও সত্যি।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়ের সঙ্গে তা হ'লে লেখার বিয়ে হবে না?"

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "না।"

পিতার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা সুকুমারের সমস্ত অন্তরকে ভয়ানক বিরক্ত করিয়া তুলিল। উত্তাপের সহিত সে কহিল, "যত দূর ব্যাপারটা এগিয়েছিল তার পর এমনি করে হঠাৎ বিয়েটা বন্ধ হ'লে, লোকের চোখে কি সেটা বিশ্রী ঠেকবে না? আপনি লেখাকে বুঝিয়ে বলুন। মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় না থাকলেও তিনি যখন শুনছি পাটনায় এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি এ বিষয়ে কথা কইব। কথা কইবার আমার একটা দাবী তো আছে।"

মিত্র-সাহেব শুধু একটুখানি হাসিলেন। পুত্রের চেষ্টা যত প্রবলতরই হউক, সবই যে নিষ্ফল, সে নিরাশার বাণীটা আর তিনি সুকুমারকে বলিলেন না।

বয় কার্ড আনিল; মিঃ রায়, বার-এট-ল।

মিত্র-সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার গৃহে শৈলর আগমনের এ প্রথা তো বহু দিন উঠিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া শৈল এ দূরত্বটুকু টানিল, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সাক্ষাতের সম্মতি দিয়া পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "শৈল এসেছে।"

শৈল কক্ষে প্রবেশ করিল। স্বাগত সম্ভাষণের পূর্ব্বেই মিত্র-সাহেব ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "শৈল, তোমায় এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছিল?"

"হ্যাঁ, পাটনায় এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। সেটা ছাড়তে তবে বার হতে পেরেছি।"

মিত্র-সাহেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কই, আমি তো কিছু জানতুম না। তুমি এসেছ শুনেছি, সুকু এসেছে, আমি একটু ব্যস্ত ছিলুম।"

সুকুমারের পানে চাহিয়া একটা অভিবাদন করিয়া শৈল একটুখানি হাসিল। কহিল, "আমরা যখন ইংলণ্ডে ছিলুম, তখন পরস্পরে পরিচিত হলেও বন্ধুত্বটা এমন নিকট হবে তা জানতুম না।"

প্রত্যভিবাদন করিয়া সুকুমার হাসিল। শৈল তাহার বিলাতের অনেক কীর্ত্তি জানিত, চোখের ইঙ্গিতে সব নিষেধ করিয়া ভাল মানুষটির মত সুকুমার গল্প জুড়িয়া দিল।

মিত্র-সাহেব অন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "শৈল, ব্রজর বিষয় সম্বন্ধে সব বন্দোবস্ত তো শেষ হয়ে গেছে?"

শৈল কহিল, "এক রকম প্রায়। বাড়ীখানা যাতে না যায়, সেই চেষ্টা কচ্ছি। বিশ্বাস, যাবেও না।"

"ব্রজর মেয়ের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলে?"

মিত্র-সাহেব রুদ্ধনিশ্বাসে শৈলর মুখের পান চাহিলেন।

বিলীনপ্রায় দিবালোকের পশ্চাতে অন্ধকার-যবনিকা নামিয়া আসিলে, তাহার উপর অকস্মাৎ যে রক্তাভা দেখা দেখ, শৈলর সুগৌর মুখখানির উপর তেমনই ম্লান আভা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল,—"তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু করি, এ তিনি পছন্দ করেন না।"

অন্তরের বিস্ময়টা ভব্যতার দুর্গমধ্যে বন্দী রহিল। মিত্র-সাহেব কহিলেন, "ছেলে-মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে তুমি নিশ্চিত ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা পেয়েছিলে?"

শৈল একটু থামিল। একবার ইতস্ততঃ করিল। তার পর কহিল, "না, তিনি বেশ বুদ্ধিমতী, বিষয় সংক্রান্ত জটিল কথাগুলি আমার সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবে আলোচনা মীমাংসা করেছেন। কোথায়ও একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করেন-নি।"

মিত্র-সাহেব নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শৈলর প্রতি চাহিলেন।

শৈল কহিল, ষাট হাজার টাকায় বাড়ীটা বাঁধা আছে। কতকগুলা জমি-টমী বিক্রী করে কতক টাকা শোধ দিয়েছি। বাড়ীর যত কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, সব নিলামে বিক্রী করে খুচরা দেনা, লোকজনের মাহিনা যা কিছু ছিল মিটিয়ে দিয়েছি। তেতালাটা বাদ দিয়ে বাড়ীটা আগাগোড়া ভাড়া দিলুম। অত বড় বাড়ী মোটা রকম আয় হয়েছে। সব টাকা যাবে দেনায়। খালি তা হতে পঞ্চাশটি করে টাকা তিনি নিজের খরচের জন্য নেবেন।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচা তো তুমি করলে?"

শৈল ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিল, "না, তাঁর গহনা বিক্রী করে সামান্য ভাবেই তিনি করেছেন।"

"তা হলে টাকা-কড়ির সম্বন্ধে সে তোমার কোন—"

মিত্র-সাহেব থামিলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শৈলর মুখের দিকে চাহিলেন, সবিস্ময়ে দেখিলেন, শৈলর আয়ত নেত্রে বুদ্ধির সে তীক্ষ্ণতা নাই। তাহার কণ্ঠস্বর যেমন ক্লান্ত, দৃষ্টিও তেমনই শ্রান্ত। বহির্জগতের সবটুকু যেন দেখিয়া লইতে চাহিতেছে না, অন্তর্মুখী হইয়া সে যেন নিজের ভিতর কি একটা খুঁজিতেছে।

শৈলর ঘুমন্ত মনটা হঠাৎ যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। সহসা চমক্‌ভাঙ্গার মত কহিল, "না, তিনি আমার কোন সাহায্য নিলেন না। খালি খানিকটা খাটুনী ছাড়া। আমি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলুম—"

রুদ্ধনিশ্বাসে সপুত্র মিত্র-সাহেব শৈলর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। শৈল কহিল, "অনিলা সম্মতি দিলেন না।"

মিত্র-সাহেবের মনে হইল, কোন রহস্যময় দেবতা তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেছেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাঙ্‌-নিষ্পত্তি হইল না। নিষ্পলক নেত্রে তিনি শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শৈল সত্যই তাঁহার সম্মুখে, না তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন?

জিনিসের ভিতরটা যে দেখিতে পায় না, ভাবনার বালাই তাহার থাকে না এবং জিজ্ঞাস্যটা হয় যেমনই নিঃসঙ্কোচ, বক্তব্যটা হয় তেমনই স্পষ্ট।

সুকুমার কহিল, "মিস বোস্ কি অন্য কোথাও বাক্‌দত্তা হয়েছেন?"

শৈল সুকুমারের মুখের পানে একবার চাহিল। তার পর একটু-খানি হাসিল। এবং তাহাতে সুকুমার যতখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন মিত্র-সাহেব। তিনি কহিলেন, "তা হ'লে তুমি এখন কি স্থির করছ?"

"কোন্ বিষয়ে ?" বলিয়া মুখ তুলিয়া শৈল সবিস্ময়ে দেখিল, একখানি খদ্দরের সাড়ীতে সাজিয়া একটি খদ্দরধারী যুবকের সহিত কথা কহিতে কহিতে সুলেখা অন্য এক কক্ষ হইতে বাহির হইল। সাশ্চর্য্যে শৈল কহিল, "সন্তোষ!"

সন্তোষ কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে সকলকে অভিবাদন করিয়া শৈলকে কহিল, "হ্যাঁ, আমি সন্তোষ। আমি মিস্ মিত্রকে নিতে এসেছি। আমাদের সমিতির মিটিংএর উনি আজ প্রেসিডেণ্ট হবেন। তোমার সব খবর ভাল ত ? সব হাঙ্গামা সেরেছ ?"

"হ্যাঁ, এক রকম মিটেছে।" শৈল আর কোন প্রশ্ন করিল না। অদূরে অবস্থিত সুলেখার পানেও চাহিল না।

মিত্র-সাহেব কন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন, "কোন নিষেধই তো শুনবিনি, মা। শুধু এইটুকু ভুলিস-নি, তোর সেবা না পেলে বুড় বয়েসে এ প্রাণটুকু বাঁচবে না।"

সুলেখার গম্ভীর মুখখানা মৃদু হাসির আলোয় ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অভ্যাগতের পানে চাহিয়া একটা ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া সন্তোষের সহিত সে কক্ষ ছাড়িয়া গেল।

ভগিনী যখন দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল, পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেল, সুকুমার তখন ঘুরিয়া পিতার মুখের পানে চাহিল। আগুনে পোড়া লোহার মত ভিতরের ক্রোধ তাহার সুগৌর মুখখানাকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিক্ত-কণ্ঠে সে কহিল,"এইগুলা কি সব ঠিক হচ্ছে, বাবা ?"

"কোন্‌গুলা, সুকু ?"

সুকুমারের মনের দুর্জ্জয় ক্রোধটা নিমেষে যেন বোমার মত শতধা হইয়া পড়িল। উত্তেজিত-কণ্ঠে সে কহিল, "যার তার সঙ্গে মিশে লেখার এই ধেই-ধেই করে বেড়ান ?"

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "যার তার সঙ্গে তো ও মেশেনি। সন্তোষ শিক্ষিত। তিন বার জেল খেটেছে।"

মুখ বাঁকাইয়া পুত্র কহিল, "ভয়ানক জোর সার্টিফিকেট! পরণে খদ্দর, আর জেলের ফটকে বার-দুই মাথা গলালেই মানুষ চেনা হয়ে গেল! তার চেয়ে সৎ ব্যক্তি আর পৃথিবীতে নেই, বিশেষতঃ মেয়েদের চোখে!"

পিতা-পুত্রের আলোচনার মাঝে শৈল কোন কথাই কহিল না। চেয়ার ছাড়িয়া কহিল, "আমাকে এইবার যেতে হবে।"

মিত্র-সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিলক্ষণ, তুমি চা খাবে না?"

শৈল কহিল, "ডাক্তার ওটা আমায় দিনকতক বন্ধ রাখ্‌তে বলেছেন।"

সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়, আপনার বাড়ীতে গেলে কোন্ সময়ে আপনার দেখা পাব?"

"কোর্টের টাইম ছাড়া যখন আপনার সুবিধা হবে।" বলিয়া অভিবাদনের পর শৈল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।
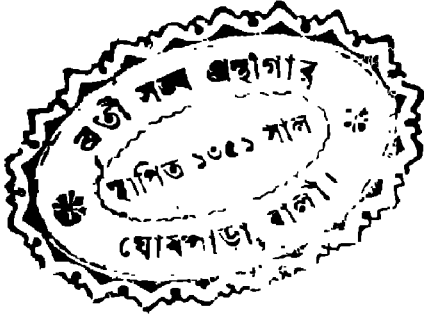
২৬

শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া শৈল মিত্র-সাহেবের গৃহে গিয়াছিল, মনটাকে একটু হাল্কা করিবে, চিত্তে আনন্দ পাইবে ভাবিয়া। তাহা না হইলে, সাত দিন জ্বর ভোগ করার পর, প্রথম পথ্য পাইয়া দুর্ব্বল দেহখানাকে লইয়া যখন সে মোটরে উঠিয়াছিল, তখন সেই বিশুষ্ক দেহটা গৃহাভ্যন্তরের বিছানাটার জন্যই আকুল হইয়াছিল।

কিন্তু নিজের ভাণ্ডার যখন প্রকৃতই শূন্য থাকে, ধার চাহিতে গেলে পাওয়া তখন দুঃসাধ্য। মনের পাথরখানা নামাইবার জন্য, শরীরের কষ্টটাকে অবহেলা করিতে সে দ্বিধা-বোধ করে নাই। কিন্তু যখন নিজের গৃহে সে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, সেই পাথরখানা যেন দশগুণ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহা বহনের অসহনীয় ক্লান্তিটা শুধু মনে নহে, দেহেও যেন একটা যন্ত্রণার স্থচ ফুটাইতেছে। কঠিন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখের বিশীর্ণ নদীটাতে হঠাৎ বন্যার বিদ্রোহী সলিলরাশি ক্ষিপ্ত হইয়া বাঁধন-কষণকে দু'পায়ে দলিয়া দিতে চাহিল। সুলেখার এরূপ আচরণ, শৈলর পক্ষে শুধু অভাবনীয়—অপ্রত্যাশিত নহে, এ যেন তাহার স্বপ্নের অতীত। তথাপি, এ বিষয় লইয়া অভিযোগেরও কিছু নাই। কিন্তু নাই বলিলেই দুনিয়ার অনেক গোল মিটিয়া যায় না। অবাধ্য-মন অকস্মাৎ এমনই অদ্ভুত কিছু একটা করিতে উদ্যত হইল যে, তাহা যেমন আকস্মিক, তেমনই হাস্যাস্পদ।

বিছানাটার উপর পড়িয়া শৈল ছটফট করিতে লাগিল। শ্রমের ক্লান্তি তাহার দুই চোখে ঘুমের স্নেহস্পর্শ না দিয়া যেন নির্মম হস্তে ঘুমের তন্দ্রাটুকুকে অবধি মুছিয়া দিল। ক্ষুব্ধ অন্তর থাকিয়া থাকিয়া দু'খানি সেবাভরা কোমল হাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল! গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন কক্ষে একাকী বিছানার উপর শুইয়া শৈলর সহসা দীর্ঘকাল-বিস্মৃত পত্নীকে মনে পড়িল। সেই স্বল্প দিনের সঙ্গিনী সুনীলার জন্য আকস্মিক তাহার দুই চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। যে দিন পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সে দিন সে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই; আজ যতখানি চোখের জলে উপাধান সিক্ত করিল।

দেশমাতৃকার সেবায় সুলেখা যে যথার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সংবাদপত্রের মারফত ও মানুষের মুখে শৈল তাহা জানিতে পারিত। ইহাতে তাহার মনটা এক একবার বিকল হইয়া উঠিত।

ছাত্র-জীবনে দেশকে সে-ও হৃদয় দিয়া ভালবাসিত। অনেক কিছু বিরাট কল্পনা সেদিন মনের মাঝে কত না আকাশকুসুম রচনা করিয়া গিয়াছে। বাস্তবের কঠিন সংঘাতে সে তাসের ঘর ধূলিসাৎ হইয়াছে। তথাপি সে স্মৃতি মনে পড়িবামাত্র গঙ্গা-যমুনার পাশাপাশি ছুটিয়া চলিবার মত হর্ষ-বিষাদ এক সঙ্গেই মনের মাঝে উথলিয়া উঠে।

অতীতে এক দিন সুলেখাকে মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া প্রাণের অনেক গোপন কথাই শৈল বলিয়াছিল। নিজের জীবনের আশা, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা কোন্ হিমাদ্রির শীর্ষদেশে উঠিয়া সাফল্য ও জয়ের আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে, দয়িতা বলিয়া তাহারই কাণে সে তাহা ঢালিয়া দিয়াছিল। মনোনীতাকে মানসী প্রতিমারূপে জ্ঞান করিয়া তাহার কাছে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতে তাহার কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা ছিল। আজ যথার্থ-ই সুলেখা তাহারই পরিকল্পিত আদর্শ স্থানটিতে পা

ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশে নাই শুধু শৈল। শৈলর পশ্চাতের শত বাঁধন কেন সহস্র বাহু মেলিয়া যাত্রার গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে।

ব্রজমোহনের বন্ধকী বাড়ীখানাকে ঋণের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অনিলাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে শৈল যেন নিজের কাছে নিজেই মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের মাঝে ঋণ পরিশোধের তীব্র সঙ্কল্প শৈলর অভিমানাহত অন্তর অনিলার নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

নিজকে প্রেচ্ছন্ন রাখিয়া সে অনিলার শুধু উপকার করিয়া যাইবে। এবং চিরদিন কিছু গোপন থাকে না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে যে দিন তাহার শুভ উদ্দেশ্য ও কর্ম্মগুলা অনিলার চোখের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে, সে দিন এই অদ্ভুত মেয়েটি কোন্ অহঙ্কার দিয়া তাহাকে প্রতিহত করিবে, তাহাই শুধু সে নিরীক্ষণ করিতে চাহে। শৈল ব্যবস্থা করিয়াছিল, বিরজামোহনকে কিছু মোটা রকম আর্থিক সাহায্য করিয়া তাঁহাকে পরিবারসহ অনিলার কাছে রাখিবে।

শৈলর এই সদিচ্ছাকে জয়ন্তী আন্তরিক ও বাহ্য উভয় দিক্ দিয়াই পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন। বিরজামোহন শুধু মাথা চুলকাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার কাছ হ'তে নেওয়া—অনিলা কি ?"

স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় জয়ন্তী বিচালি-স্তূপে অগ্নি-নিক্ষেপের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তেমনই ক্রোধভরা কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "সে অবুঝ বলে আমাদের তো চল্‌বে না। দেশ-ভুঁই ছেড়ে এই যে আমরা থাকব, আমাদের তো চলা চাই। তোমার লাট সাহেব ভাইঝির আমীরী মেজাজের কথা ছেড়ে দাও।"

পত্নীর রক্তোচ্ছ্বাস-মাখা ক্রুদ্ধ মুখখানার পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "কথাটা সত্যই তুমি বলেছ। রক্ত-সম্পর্কে পাওয়া মর্য্যাদাটাকে

মানুষ যেন দিনই ছাড়তে পারে না। রাজার ছেলের দুর্ভাগ্য তাকে ভিখারী করলে, পথের ভিখারীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে তুলতে কোন দিন সে পারে না। এই দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধানটা থেকেই যাবে।"

স্বামি-স্ত্রীর মাঝে যে বাদানুবাদটা কলহের রাস্তাটা ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল, শৈল তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিল। কহিল,—"বেশ তো, অনিলা জানবে কি করে? টাকা আমি পোষ্ট আফিসে পাঠাব, আপনি সেখান থেকে নেবেন।"

সমস্যাটার অতি সুন্দর মীমাংসা হইয়া গেল। বিরজামোহন অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে শৈলর হাতটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি দেবতার চেয়ে বড়। তাহাদের রাগ আছে, শাপ আছে, তোমার মত নিঃস্বার্থ তারা নয়। অনিলা যে ওই কথা শুনলে না, সে আমাদের কপাল।"

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরিয়া মলিন রৌদ্র যেমন নিমেষের জন্য উঁকি মারে, সেইরূপ শৈলর মুখে ম্লান হাসি মুহূর্ত্তের জন্য খেলিয়া গেল। শৈল কহিল, "তাতে আমার নিজের কোন ক্ষোভ নেই। আমি আমার স্বর্গগত শ্বশুরের ইচ্ছাই প্রতিপালন করতে চেয়েছিলুম মাত্র।"

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! জন্মান্তরের তপস্যা না থাকলে তোমাকে পাওয়া যায় না। আমি তাই শুভাকে বলি, ঠাকুরের পায়ে নমস্কার করবি, শৈলকে যেন তুই পেতে পারিস।"

দিনের আলোর মত নির্ম্মল হাসিতে শৈলর মুখ ভরিয়া উঠিল। কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে সে কহিল, "সেটা শুভার মত মেয়ের পক্ষে দুর্ভাগ্য। তার কপালে বুড়ো বর বিধাতা লেখেন-নি।"

জয়ন্তী আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বুড়ো!—তোমাকে যে বুড়ো বলবে, তার চোখের চিকিৎসা আগে করতে হবে। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের সোমত্ত ছেলেকে বুড়ো বলা?"

শৈল কহিল, "না জ্যাঠাই-মা—অতিস্নেহে আমার বয়স আপনার কমাবার দরকার নেই। আর অতিবৈরাগ্যে—আমার বুড়ো সাজবারও দরকার নেই। বয়স আমার এই বত্রিশ বছর।

জ্যাঠাই-মা তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "শুভা তো আমার এই ষোল পার হয়ে গেল।"

সে কথায় শৈল কোন সাড়া না দিয়া বিরজামোহনের পানে চাহিয়া কহিল, "তা হলে এই কথাই রইল, জ্যাঠামশাই?"

বিরজামোহন কহিলেন, "তা তোমার যেমন ইচ্ছা, বাবাজি। তাই বলি, সন্তোষ সে-ও তো এম-এ পাশ করেছে। বুড়ো মা-বাপের চলে কিসে, এত বড় বোনটার বিয়ে হয় কি করে, না ভেবে, সে গেল দেশের কায করতে জেলে। আর যে কোন দিন একটা ভাল চাকুরী জুটবে, সে আশা অবধি রইল না।"

বিরজামোহনের জীর্ণ বুকখানা ভেদ করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল।

বিহ্বলের মত শৈল কয়েক মুহূর্ত্ত বিরজামোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল, "জ্যাঠামণি, শুভ ইচ্ছা, কল্যাণ চিন্তা কখন ব্যর্থ হয় না। যদি আমরা ঠিক ঠিক পথ ধরে খুঁজি তো ভগবান তা আমাদের এনে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমরা তা কি পারি? শুভ এবং কল্যাণের নামে বজায় করতে চাই নিজের স্বার্থ। কিন্তু অন্তর্যামীর চোখে ধূলা দেওয়া যায় না। তাই কাম্যকেও খুঁজে পাই না। সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করা বড় শক্ত, জ্যাঠামণি, তাতে যদি পদস্খলন না

হয়, তবে তোমাদের কল্যাণ-মূর্ত্তি ধরে সে আমাদের সাম্‌নে দাঁড়াবে। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। তবেই জয়ের উচ্চ সিংহাসন আমরা পাব।”

শৈলর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া আসিল। সে থামিল। বেশী কথা বলার স্বভাব কোন দিন তাহার ছিল না। কিন্তু ব্রজমোহনের মৃত্যুর পর হইতে সে সম্ভব অসম্ভব যত রকম ঘটনার মধ্যে পতিত হইতেছিল, অনিলা যতই তাহার কাছে হেঁয়ালী হইয়া উঠিতেছিল, এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষাগুলা অসহনীয় মূর্ত্তিতে যত রকমে তাহাকে আঘাত দিতেছিল, তাহারই হাত হইতে নিজেকে অবিচলিত রাখিবার প্রচেষ্টায় কথাগুলা এমন উচ্ছ্বাসের মত বাহির হইল কি না, কে জানে?

পাটনায় বসিয়া শৈল ভাবিত, বিরজামোহন, জয়ন্তী, অনিলা; এবং এক সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিত। সব চিন্তা ভুলিয়া গিয়া, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে শুধু স্বলেখার চিন্তা।

২৭

সে দিন সকালে মিত্র-সাহেবের পত্রে শৈল জানিতে পারিল, দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত পল্লীমায়ের বিস্মৃতপ্রায় স্নেহচ্ছায়ানীড়ে পশ্চিমের জল-বাতাস ছাড়িয়া সকন্যা তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং দৈব প্রতিকূল না হইলে, জীবনের অবশিষ্ট কালটা নিরবচ্ছিন্নভাবে সেইখানেই কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

তড়িৎলেখার মত দপ্ করিয়া শৈলর মনে পড়িয়া গেল, অতীতে এক দিন মিত্র-সাহেব বলিয়াছিলেন, "আমার ভয় করে, লেখা বলে বসে, বাবা তুমি প্র্যাক্‌টীস্ ছাড়।" এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে এক নিমিষে দেখিয়া লওয়ার মত অতীতের অনেক-গুলা কথা এক সঙ্গে সারি বাঁধিয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এক দিন সে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিল, "সেই মানুষ্যত্বের বড়াই করতে পারে লেখা, যে নিজে উঁচু হওয়ার সঙ্গে নিজের চার পাশকেও উঁচু করে তুলতে পারে। নিজে উঁচুতে উঠেছে বলে, নীচুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে না। ছোট হোক্, বড় হোক্, আমার বলেই সে আমার শ্রদ্ধার ভালবাসা পাবে।"

পত্রখানা খামের মধ্যে পূরিয়া, শৈল মামলার নথিপত্রগুলা টানিয়া লইল। মনটা যখন সম্পূর্ণ তাহার মধ্যেই আবিষ্ট হইয়া পড়িল, ঠিক

সেই সময়ে সুকুমার ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "শুনেছেন মিঃ রায়, বাবার ব্যবস্থা ?"

পিতাপুত্রে যে অচিরেই একটা তুমুল বিরোধ ঘটিবে, সেটা শৈল পূর্ব্বাহ্নেই কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্র ঘটিবে, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। মনটা একবার তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সুকুমার কহিল, "বাবা যে হঠাৎ প্রাকটীস্ ছেড়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন, এটা কি তাঁর ঠিক হল ? আর চিরকালটা স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটিয়ে আজ বুড়ো বয়সে হঠাৎ সেই পচা পাড়াগাঁয়ে থাকলে তাঁর শরীর টিকবেই বা ক'দিন ? আর আমার ভবিষ্যৎ—"

সাশ্চর্য্যে শৈল কহিল, "আপনার ভবিষ্যতে আবার কি হলো ?"

"সব দিক্ দিয়ে ক্ষতি। যার পরিমাপ হয় না। বাবার সাহায্য না পেলে দাড়াব আমি কিসের জোরে ? ইংলণ্ডে যখন আমি ছিলুম, বাবার কাছ হ'তে কত আশা প্রতিপত্রে পেতুম, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সবই আকাশ-কুসুম !"

"বেশ তো, আপনি মিঃ মিত্রকে এ বিষয়ে একটু বুঝান-নি কেন ?"

"বুঝাব ? কি বল্‌ছেন, মিঃ রায় ? দস্তুরমত রাগারাগি হয়ে গেল। তিনি লেখারই সব, আমার বিষয়ে তিনি কিছু চিন্তা করেন না।" সুকুমার থামিল। একটা রুদ্ধ অভিমান অকস্মাৎ সমুদ্রতরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিয়া নিজেকে আছড়াইয়া শতধা করিতে চাহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সুকুমার কহিল,—"দেশের বাড়ীটার সংস্কার আরম্ভ হয়েছে শুনেছিলুম। কিন্তু তার অর্থ যে সমস্ত দেশের সংস্কার, তা বুঝতে পারি-নি ! ভাবতেও পারিনি, বাবা কোন দিন সেই জলো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু এ ত বাবার ইচ্ছা নয়। বাবা

শুধু যন্ত্র—” সুকুমার শৈলর মুখের পানে চাহিল। বোধ করি, একটা উত্তর পাইবার আশা তাহার ছিল।

একটা জমাট নিস্তব্ধতা পাথরের মত কঠিন হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। শৈল ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল? ইহার জন্য দায়ী কে? এই যে পিতা-পুত্রে ভ্রাতা-ভগিনীতে একটা অভিমান, অভিযোগ, বিরোধ সৃষ্টি হইতেছে, ইহার জন্য প্রকৃত দোষী কে? অগ্নির একটা সামান্য স্ফুলিঙ্গ যে ফেলিয়া দেয়, সমগ্র দেশ ধ্বংসের জন্য অপরাধী তাহাকেই করা হয়। অগ্নি তো নিজের ইন্ধন নিজেই সংগ্রহ করিবে।

সুকুমার আরম্ভ করিল, “সে যেন একটা রাজসূয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। দেশের ম্যালেরিয়া তাড়াবার জন্য জঙ্গল সাফ হতে আরম্ভ করে টিউব-ওয়েল বসান, পুকুর কাটান, স্কুল বসান, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃ-শিক্ষা-নিকেতন—কত কি সব নাম বেরিয়েছে। আর এ সব কায দূরে বসে হয় না বলেই লেখা আর বাবা সেখানে স্থায়ী হলেন। আর ব্যাঙ্কের বইটাও সেখানে যেতে বাদ যায়-নি। শেষকালে চাঁদার খাতা-হাতে লেখা ভিখারীর মত বাড়ী বাড়ী ঘুরছে।”

শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। যে আলেখ্য-খানাকে উৎসাহের সহস্র বাতি জ্বালিয়া শৈল শুধু এক দিন আরতি করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই জীবন্ত প্রতিমার পদতলে সুলেখা লক্ষ বাহুতে অঞ্জলি দিতেছে, ইহার চেয়ে বড় বার্ত্তা আর কি আছে? তথাপি শৈলর মুখের চেহারাটার দিকে চাহিলে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ অবধি বোধ করি ভাবিতে পারিবে না, তাহাতে একটুখানি আনন্দের চিহ্ন আছে।

সুকুমারের সহসা যেন মনে হইল, শৈলর রহস্যাবৃত অন্তরের তলাটা সে দেখিতে পাইয়াছে। হঠাৎ সে চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া

বসিয়া শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "মিঃ রায়, আমি একটুখানি আপনার সাহায্য চাইছি। আশা করি, আমি তা পাব।"

শৈল চকিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি কি চাইছেন, যতক্ষণ না সেটা জান্‌তে পাচ্ছি, ততক্ষণ কোন বিষয়ে কিছু আশা দিতে পাচ্ছি না।"

—"আপনি এই পাশার ছকটা উল্টে দিন। আমরা ত জানি, লেখার উপর আপনার ক্ষমতা কতখানি।"

শৈলর মুখে একটা রক্তের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে কহিল, "আমি গিয়ে তাঁকে কি এ সব করতে মানা করে আসব?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বরটা অনেকটা বিদ্রূপের মত শুনাইল।

সুকুমার রাগিল না। সহজ কণ্ঠে কহিল, "এর মাঝে তো অন্যায় কিছু নেই। আমি জানি, আপনি এক জন দেশভক্ত—যেমন এক দল লোক ভালবাসে আত্ম-বন্ধু, ঘর-দুয়ার; সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও তারা ভালবাসে। নিজেদের পরাধীন ভাবতে লজ্জা বোধ করে। তাদের মাঝে কোন দিন সর্ব্ব-হারা ভালবাসার নেশা থাকে না। নিজের ভাল-মন্দ, দেশের ভাল-মন্দ সেখানে নিক্তির ওজনে মাপা হয়। আর মিস্ বোস, তিনি তো আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, লেখার কাছে আপনি বাক্‌দত্ত হয়েছিলেন। বাবার মুখে ঘটনাটা আমি শুনেছি।"

শৈল কহিল, "শোনা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এতে আপনার কি বিশেষ সুবিধা আছে, আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না।"

সুকুমার হাসিল। শৈল যে একটা গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিতেছে, অন্তরের ভালবাসাটা বুদ্ধির ধারকে রুদ্ধ করিতেছে মনে করিয়া ভিতরে ভিতরে সে আমোদ বোধ করিল। কহিল, "সোজা গিয়ে আপনি লেখাকে বিবাহের প্রস্তাব করুন। তার পর আমার ভাল-মন্দ আমি বুঝে নেব।"

গ্রীষ্মের দিনে গুমোট রাত্রির মত শৈলর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "ধন্যবাদ, আপনি উত্তম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আপনার ভাল-মন্দটা আমায় দয়া করে বুঝিয়ে দিন।"

সুকুমার চকিত হইল। শৈলর কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা; উক্তিগুলা পরিহাস না তিরস্কার, তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া শৈলর মুখের পানে সে একবার চাহিল। কহিল, "বাবার এই দেশসেবার প্রেরণা শুধু সুলেখা। সে যদি ভাগ্যবন্ত মেয়েদের মত গৃহিণী হবার, মা হবার আকাঙ্ক্ষায় শান্ত হয়, বাবার মন সেই মুহূর্ত্তে ঘুরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অদৃষ্টের চাকাও ঘুরবে।"

শৈল কহিল, "আমাকে বিয়ে করলে সুলেখা যে দেশের কায করবে না, এর কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন?"

সুকুমার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, নিশ্চিত পেয়েছি, স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হবে, এ সংস্কার আমাদের দেশের মেয়েদের অস্থি-মজ্জায় জড়িত আছে। হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের যে বাঁধন তারা দিয়েছে, তা হতে মুক্তি তারা কোন দিন পাবে না।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "এটা শুধু বক্তৃতার উচ্ছ্বাস, বর্ত্তমানের দিকে চেয়ে আপনি কথা কইবেন আশা করি।"

সুকুমার উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "আমি বর্ত্তমানের দিকেই চোখ রেখে কথা বল্‌ছি।—আমি অনেক মহিলাকে জানি, যাঁরা এক দিন অসূর্য্যম্পশ্যার মত অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতেন, এখন তাঁরা ইউরোপে গিয়ে পর্দ্দার বাইরে গিয়েছেন। আপনি বল্‌বেন, এটা স্বাধীনতার হাওয়া, আমি বলি তা নয়—স্বামীর রুচি অনুযায়ী নিজকে খাপিয়া তোলা। সেই যে কবে আদি যুগে এঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন, ঋষি-মুখে—স্বামীর অনুগামী হও; সে মন্ত্র সজীব হয়ে আজিও এঁদের মাঝে

জেগে আছে। এ আমার নিজের দুই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা, আমার মা পাড়াগেঁয়ের সংসারে জন্মেছিলেন, বাবার এতখানি সাহেবীয়ানার মাঝে কোথায়ও তাঁর এতটুকু বাধেনি।"

সুকুমারের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে থামিল, স্বর্গগতা জননীর কথা স্মরণ হইতে বুকের মাঝে স্মৃতি-সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল।

ক্ষণ পরে সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়, আমার মা চলা-ফেরা সব ব্যাপারেই ইউরোপীয় মহিলার মত আচরণ করতেন, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি—তাঁদের মতই হয়েছিল। পিতৃ-গৃহের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল—আমার দিদিমার শেষ সময়ে মা তাঁর মুখে জল দিতে পাননি শুধু স্বেচ্ছাচারিতার অপরাধে। সেই মা যখন মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর পাশে, বাবা মাথার কাছে বসে।" সুকুমার চোখ মুছিয়া কহিল, "মা সজ্ঞানে মারা গেলেন। বাবাকে বললেন, তোমার পা দাও, আমি পায়ের ধূলা নেব। এর আগে কেউ আমার মাকে বাবার পায়ে প্রণাম করতে দেখিনি।"

রুদ্ধনিশ্বাসে শৈল সুকুমারের মুখের পানে চাহিয়াছিল। অজানা এক মহিলার অশ্রুত জীবন-কথা শুনিবার প্রবল ইচ্ছা তাহার দুই চোখে ফুটিয়া উঠিল।

সুকুমার কহিল, "বাবার পায়ের ধূলা নিয়ে মা একটু হাসলেন, বল্লেন,—'মার মুখে জল দিতে পাইনি, বড্ড দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মনকে বুঝিয়েছিলুম—তুমি যা চাও, যা ভালবাস, আমি তো তাই শুধু পালন করেছি। মা আমাকে আশীর্ব্বাদই করেছিলেন, তুমি সীতা সাবিত্রী হয়ো। তাই আমার খালি মনে হ'ত—তারা সবই ত্যাগ করেছিল স্বামীর জন্যে। আর আমি এটুকু পারব না? আমার ভক্তি সার্থক হয়েছে। স্বর্গে মা আমায় ভাগ্যিমানী মেয়ে বলে জড়িয়ে

ধরবেন। এইবার বলুন দিকি মিঃ রায়, আমার মার স্বেচ্ছাচারিতার মাঝে হিন্দু নারীর শিক্ষার এতটুকু শৈথিল্য ঘটেছিল কি? তেমনি সুলেখাকেও আপনি জানবেন, ও যে মুহূর্ত্ত থেকে আপনার হবে, সূর্য্যমুখী ফুলের মত সেই নিমেষ হতে আপনার পানেই চেয়ে থাকবে। এটা তো নিশ্চিত, দেশকে আপনি ভালবাসলেও এমন ভিখারী হবার খেয়াল আপনার নাই। সে অবস্থা আপনার নয়। এ সব আপনার তো চল্‌বে না।"

শৈল কহিল, "আমার কি চল্‌বে, না চল্‌বে, সে বিচার আমি এখুনি কর্‌ছি না। আপাততঃ এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, সুলেখাকে বিয়ের প্রস্তাব করলেই আমি তার সম্মতি পাব না। আর আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাবও করতে পারব না। কেন যে পারব না, এটুকু আর দয়া করে আপনি জিজ্ঞেস্ করবেন না।"

শৈল চেয়ারের পিঠে নিজের দেহটা এলাইয়া দিল। আর ঠিক তাহারই সম্মুখে টেবলের অপর প্রান্তে বসিয়া সুকুমার বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে নিঃশব্দে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

২৮

"তার আয়া সাব্।"

একটা সই দিয়া শৈল টেলিগ্রামখানি তুলিয়া লইল।

বিরজামোহন সপরিবার কাল প্রভাতে শৈলর বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন, আজ রওনা হইয়াছেন।

দপ্ করিয়া শৈলর মনে পড়িয়া গেল, বেশী দিন নহে, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এমনই সন্ধ্যায় বার্ত্তা আসিয়াছিল, ব্রজমোহন আসিতেছেন। আজ তাঁহারই আত্মীয় আসিতেছেন, কিন্তু সে-দিনে এ-দিনে যেন কত যুগের ব্যবধান। এমন করিয়া অনেক নিকটতম, দূরতম, আত্মীয়, অনাত্মীয় আকস্মিক বার্ত্তা দিয়া অথবা কেহ না দিয়া তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়া শৈলকে ধন্য করিয়াছেন। এই অভাবনীয় অচিন্তনীয়দের সহ্য করা তাহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সমস্ত বুক জুড়িয়া একটা ব্যথা যেন বর্ষার দিনের আকাশের মত সমস্ত মনটাকে ক্ষণে ক্ষণে বিবশ, বিষণ্ণ করিতে লাগিল।

রাত্রিকালে শৈল বিছানায় শুইল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত বিছানাটা তাহার কণ্টক হইয়া উঠিল। একটা অত্যন্ত অপরিচিত দুঃখ যেন তাহার সারা অঙ্গে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। সুকুমারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া চিত্তে যতই সে আনন্দ দিতে চেষ্টা করিল, বুঝাইতে চাহিল, একটা কঠোরতম পরীক্ষায় সে

উত্তীর্ণ হইয়াছে, ততই অবুঝ অন্তরটা ব্যথার কান্নায় যেন গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

ঘুম ভাঙ্গিতে শৈলর ঈষৎ বেলা হইল। ঊষার প্রথম আলোককণা বিশ্ব-বুকে পা-ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ত্যাগ করা তাহার অভ্যাস; চাহিয়া দেখিল, রুদ্ধ শার্সিগাত্রে রৌদ্র পড়িয়াছে, কিন্তু নিজের কাছে নিজে সে ত্রস্ত হইয়া পড়িল না বা দিনের এই প্রথম অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে অন্তরে তাহার এতটুকু উৎসাহ অবধি জাগিল না। শোকাতুর যেমন ব্যথার সহিত ঘুমাইয়া পড়ে, আবার সেই ব্যথাটা লইয়াই জাগে, তেমনই একটা নিরানন্দ লইয়াই সে হাত-মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

ষ্টেশনে মোটর পাঠাইবার মুহূর্ত্তে শৈল একবার ভাবিল, তাহার নিজের যাওয়া উচিত। বিরজামোহনের সহিত নিশ্চয় অনিলা আসিতেছে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে শৈল না গেলে তাহার একটা ভয়ানক ক্রটি ঘটিবে। কিন্তু সারা রজনীর অনিদ্রা হেতু ক্লান্তি দেহটাকে অকস্মাৎ ভয়ানক বিমুখ করিয়া তুলিল।—সে আজ হাসিমুখে কাহাকেও সাদর সম্ভাষণ দিতে পারিবে না।

চা খাইয়া শৈল পড়িবার ঘরে আসিল। দুষ্ট ঘোড়াকে কাঁটা-ফাজাই মুখে দিয়া বশীভূত রাখার মত মামলার কাগজপত্রের মাঝে উৎক্ষিপ্ত মনটাকে সে আবদ্ধ করিতে চাহিল। তাহা হইলেই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের শত জঞ্জাল সৃষ্টির সাময়িক বিরতি ঘটিবে। বহু পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা ব্রীফ্ সে খুলিয়া আইনের পুস্তকগুলা টানিয়া লইল, দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ হইল না—তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এমনই গোলমালের মাঝে খানিকটা সময় অতিবাহিত করিতে করিতে চমকিয়া শৈল মুখ তুলিয়া মোটরের হর্ণ শব্দে বুঝিল, মাননীয়

অতিথির দল আগমন করিলেন। ক্ষণ পরেই জুতার শব্দ তাহার কক্ষের বারান্দায় শ্রুত হইল। এখনই গিয়া অভ্যাগতদিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে হইবে। বর্ত্তমানে তাহা সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শৈল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার অবাধ্য চিত্ত ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত ভয়ানক বিদ্রোহ জুড়িয়া দিল। শাসনের চাবুক সে কিছুতেই মানিতে চাহিল না। ক্লান্তভাবে শৈল চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল।

মানুষের মন যখন বিরোধ করে, কথা শুনে না,—তখন দুঃখের মাপকাঠি হারাইয়া যায়। তাহার পানে চাহিয়া অন্তর্য্যামী বোধ করি ব্যথিত হন। শৈল দুই হাতে মুখ চাপা দিয়া চেয়ারখানার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

দুয়ারের পর্দ্দা সরিয়া গেল। জুতার শব্দ কক্ষতলের কার্পেটে ধ্বনিত হইল না। শৈল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিল। উচ্চ হাস্যে শুভা কহিল,—"জামাইবাবু, চোখে হাত দিয়ে ধ্যান করা অভ্যাস কচ্ছেন না কি?"

শৈল কথা কহিতে গেল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না। শুভা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আপনার চোখ অত লাল কেন, জামাই-বাবু?"

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শৈল আপনাকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইল। ফাঁসীর আদেশটা প্রথম গোচরীভূত হইলে যতখানি আঘাত মনে বাজে, অন্তরকে বিহ্বল করিয়া তুলে, দড়িটার নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে ততখানি কাতরতা আসে না। দুঃখের প্রথম আঘাতটাই ভূমিতে লুটাইয়া দেয়, তার পর সেইটাই সহনীয় হইয়া মানুষকে তুলিয়া দাঁড় করায়।

শৈল কহিল—"মাথাটা বড্ড ধরেছে। তোমাদের পথে তো কোন কষ্ট হয়নি, শুভা? চল, জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার কাছে যাই।"

জয়ন্তীকে শৈল প্রণাম করিতেই তিনি অঙ্গুলির প্রান্ত শৈলর চিবুকে ছোঁয়াইয়া স্নেহ-চুম্বন দিয়া কহিলেন, "আমরা আশা করেছিলুম, তোমায় ষ্টেশনে পাব।"

অতি সামান্য একটা ঘটনা বা তুচ্ছ দুই একটা কথা অনেক সময়ে বড় বড় জবাবদিহির হাত হইতে মানুষকে অতি সহজভাবেই অব্যাহতি দেয়। শৈল কোন কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শুভা তাহা সারিয়া দিল। কহিল, "জামাইবাবু যাবেন কি করে? ওঁর কি রকম মাথা ধরেছে, চোখ্ দেখে বুঝ্তে পাচ্ছ না?"

জয়ন্তী গায়ে হাত দিলেন। কহিলেন,—"ওমা, তাই! দেখ্ছ শৈল, শুভার দৃষ্টি তোমার উপর কি রকম। এই তোমাকে যথার্থ ভালবাসে।"

অতিতুচ্ছর মাঝে বৃহত্তরের ইঙ্গিত থাকা কিছু নূতন নহে, খুঁজিলেই পাওয়া যায়। এই তড়িৎ শক্তি যাহা বিশ্বমানবের সম্পদের একটা ভিত্তি, সে-ও এক দিন অতি সামান্যর মাঝেই অকস্মাৎ ধরা পড়িয়াছিল। জয়ন্তী রহস্যচ্ছলে অতি সামান্য হাস্য-পরিহাসের মাঝে যে প্রকাণ্ড অর্থ-টাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া শুধু একটা ইঙ্গিত দিলেন, সেটা ঠিক তেমনই রহস্যের পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া অতি সরল উত্তরের মাঝে শৈল খান্-খান্ করিয়া দিল।

হাসিমুখে শৈল কহিল, "ভালবাসাই তো আমাকে উচিত। দাদাকে ভাল কে না বাসে? কি বল, শুভা? সন্তোষের মত আমি নই কি?"

মুহূর্ত্তে জয়ন্তীর মুখ আঁধার হইয়া গেল। বিরজামোহন কহিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমরা তো তাই অসঙ্কোচে তোমার কাছে ছুটে

আসতে পেরেছি! কিন্তু অনিলা পারলে না।” বিরজামোহন একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

ক্ষিপ্ত জন্তু প্রবলবেগে সম্মুখে ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ যদি সে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে ছুটিয়া যায় তো সর্ব্বাগ্রে মানুষের মুখ দিয়া খপ্‌ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ-মুক্তির প্রথম তৃপ্তিটা এক সঙ্গে সেই নিশ্বাসের মাঝেই ঝরিয়া পড়ে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিরজামোহনের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, “তিনি এলেন না?”

“না, কিছুতেই এল না।”

জয়ন্তী কহিলেন, “এত বোঝালুম, বল্‌লুম, একলা থাকতে পারবি?' একটু হাসলে—বল্‌লে, আমি সব পারি।”

কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিতে শৈল জয়ন্তীকে কহিল, “আপনি তবে আসুন এ-দিকের ঘর-দরজা দেখতে। আমি আপনাদের আলাদা বামুন-চাকর ঠিক করেছি। আমার এ-সব তো আপনাদের চল্‌বে না।” শৈল একটু হাসিল।

সানন্দে জয়ন্তী কহিলেন, “না বাবা, বুড়ো বয়সে তো ও-সব আমাদের আর চল্‌বে না। তা তোমার অসুবিধা হবে—”

বাধা দিয়া শৈল কহিল, “না, না, কিছু নয়। আমার বৌদিদিরা যখন তখন এসে এসে এ-সব আমাকে অভ্যস্ত করে দিয়ে গেছেন। আর আপনাদেরও বিশেষ অসুবিধা হবে না। কারণ, বৌদিদিরা নিজেদের ব্যবস্থা সব ভাল করেই রেখে গেছেন।

সায় দিয়া উৎসাহ সহকারে জয়ন্তী কহিলেন, “তা আর করবে না, বাবা। বিদেশে একটা আপনার জন থাকলেই সবাই সেখানে যাবে

মাঝে আস্তানা গাড়তে ছুটে আসে, এ সর্ব্বত্র। তা হ্যাঁ শৈল, তোমাদের মিত্তির সাহেব তো আমাদের এই দেশের লোক বাছা, তা কক্ষনো দেশের মুখ দেখতেন না, একেবারে সাহেব হয়ে গেছ্‌লেন। এখন তেমনি সন্তোষের পাল্লায় পড়েছেন। পাল্টা শোধ দিতে হচ্ছে।"

বিরজামোহন কহিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! মিত্তির পাড়ারই ছেলে ছিল। তবে কলকাতায় পিসীর বাড়ীতেই মানুষ। ছোট বেলা হতে ম্যালেরিয়া বলে দেশে যেত না। দেশে প্রকাণ্ড বাড়ী, হানাবাড়ীর মত যেন খাঁ-খাঁ করত। তা সন্তোষ কাযের ছেলে আছে। ওর সেই মেয়েকে বাগিয়ে—বুঝেছ—হাঃ হাঃ— কি আর বলব, জন্মভূমি দীর্ঘ দিনের অবহেলার শোধ নিচ্ছেন, কি বল বাবা?"

নদী জন্মস্থানেই শীর্ণা থাকে। কিন্তু যত দূরে সে ছুটিয়া যায়, ততই সে নিজেকে বিস্তার করিয়া, স্ফীত করিয়া তোলে! সুলেখার স্বদেশ-প্রীতির মূল উৎসটা অতি ক্ষুদ্র হইলেও দূরান্তে তাহার কর্ম্মধারাটা যে বহুল হইয়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু এ প্রসঙ্গ যেন শৈলকে হাঁপাইয়া তুলিল! নিস্পৃহ কণ্ঠে সে কহিল, "এ-সব কথা পরে হবে, এখন এ-দিক্‌টায় আসুন।" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

যাইতে যাইতে জয়ন্তী কহিলেন—"আহা, বাড়ী যেন ইন্দ্রভবন। এমন বাড়ী ভোগ করবার লোক নেই। শৈল, তুমি সংসার পাত, এমন একা একা থেকে আর আমাদের মনে দুঃখ দিও না। পুরুষ মানুষ তুমি, সাধ-আহ্লাদ—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া একটা সজ্জিত কক্ষ দেখাইয়া শৈল কহিল, "জ্যাঠামশাই, এটা আপনার শোবার ঘর হ'লে কিছু অসুবিধা হবে না বোধ হয়। আর পাশের এই ছোট ঘরটিতে শুভা শোবে। আমি একটা নেয়ারের খাটিয়া ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

জয়ন্তী কপালে হাত দিয়া কহিলেন, "হা অদৃষ্ট, শুভাকে আমি একা আলাদা শুতে দিই না কি! না বাবা, সে-সব পাট আমার নেই। এই মেঝেতে আমরা মায়ে-ঝিয়ে বিছানা পেতে শোব। আর এই লোহার খাটে উঁনি শোবেন, সেই ভাল। আমরা গেরস্থ, এই সোজা বুঝি। ঠাকুরপোর ছিল বটে এই সব বড়মানুষী কায়দা। অনিলার এটা শোবার ঘর, এটা পড়াশুনা করবার ঘর, কিন্তু শেষ রইল কি?—তাও বলি, সে-সব ছিল সুনীলার ভাগ্যে—সেই লক্ষ্মী। এই যে দু'টি বোনে জোড়ের পায়রার মত ভাব ছিল, কিন্তু বরাত দেখ দু'জনের?"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "থাক জ্যাঠাইমা, এ-সব কথা। আমাকে একটু সকাল সকাল বেরুতে হবে। তার আগে আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দিই।"

কি একটা প্রয়োজনে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ ব্রজমোহনের সুবৃহৎ তৈলচিত্রের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। শৈল স্তব্ধ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহারই পানে চাহিয়া রহিল। আজিকার সকালটা বড় বিষণ্ণতার মূর্ত্তিতে চোখে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত বেদনা-রাশির যোগসূত্র লইয়া সে যেন আজিকে অনেক দুঃখ দিবার ইঙ্গিত করিয়াছিল। কিন্তু বাতাসে-ওড়া মেঘের মত অকস্মাৎ সে-সব কোন্ পথে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল—অন্তরের মাঝে জাগিয়া উঠিল ব্রজমোহনের একান্ত ইচ্ছাটা এবং নিজের ইচ্ছাটা জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইবার যে তিক্ততা, তাহা সেই নির্ব্বাক্ আলেখ্যখানা যেন অদৃশ্য হাতে যাদুকরের মত শৈলর চিত্ত হইতে মুছিয়া দিয়া স্নেহের দাবীর কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিল।

২৯
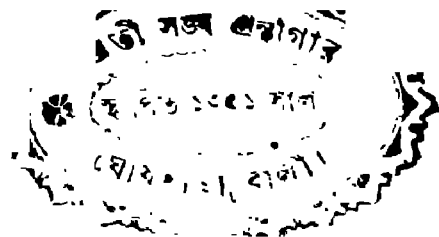
মাস কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। স্বামী, কন্যা লইয়া যে অভিযান গঠিত করিয়া জয়ন্তী শৈলকে জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা যে শুধু ব্যর্থ নহে, একটা বাতুলতা, জয়ন্তীর নিজের কাছেই বোধ হয় তাহা এইবার ধরা পড়িয়াছিল।

কিন্তু উৎকট স্বার্থপরতা উগ্র নেশার মত মানুষকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। হিতাহিত জ্ঞানটা ক্রমেই লুপ্ত হয়। স্বল্পভাষী, সংযত-স্বভাব বিপত্নীকের চিত্ত-দুয়ার যে কোন দিন তাঁহার সুন্দরী দুহিতা খুলিতে সমর্থ হইবে না, তাহা সূর্য্যালোকের মতই দীপ্ত হইয়া জয়ন্তীর চোখে যতই ধরা পড়িতে লাগিল, ততই রৌদ্রদগ্ধ বালীর মত তাঁহার ভিতরটা অনিলার উপর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং রূপহীনা, অঙ্গহীনা অভাগী মেয়েটাই যে অদৃশ্য প্রভাবে শৈলকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বুঝিয়া অনিলার উপর একটা উৎকট ক্রোধ ও দুর্নিবার প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে বুকের মাঝে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ছিদ্র না পাইলে শনি যে প্রবেশ করিতে পারে না।

শুভা আসিয়া অনিলাকে প্রণাম করিল। হাতের সেলাইটা নামাইয়া অনিলা কহিল, "বেশ তো সেরেছিস, শুভা। জ্যাঠামশাইও বেশ সেরেছেন।"

"কেন সারবেন না, অনিলাদি। ও-দেশের জল-বায়ু খুব ভাল। তুমি যদি যেতে তুমিও সারতে। ইস্, কত রোগা তুমি হয়ে গেছ!"

শীতের দিনের সূর্য্যাস্তের মত একটা দীপ্তিহারা হাসিতে অনিলা কহিল, "দূর! আমার বাপু কোথাও যাওয়া পোষায় না।"

—"কেন পোষায় না? কাকাবাবুর সঙ্গে তো কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছ। আর এই দেড়টা বছরের মধ্যে বাড়ীর বাইরে পা দিলে না। হ্যাঁ অনিলা দি, তুমি জামাইবাবুর পাটনার বাড়ী কখন দেখেছ?"

শুভা উৎসুক নেত্রে অনিলার মুখের পানে তাকাইল, যেন সে অনেক কিছু শুনিতে পাইবে।

নির্লিপ্তের মত ঔদাস্যসহকারে অনিলা কহিল,—"না, আমি কোথা থেকে দেখ্‌ব?"

"তবে তোমার চোখদুটো বৃথা," বলিয়া শুভা হাসিল। অনিলাও হাসিল। রহস্যভরা কণ্ঠে কহিল,—"দু'টো কই রে? একটা তো? দু'টো থাকলে দেখতে যেতুম।"

রহস্যের মাঝে সত্যের খোঁচাটা মানুষকে বড়ই বেশী অপ্রতিভ করিয়া তোলে। নিমেষে শুভার সমস্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল। লজ্জিত কণ্ঠে সে কহিল, "ছিঃ অনিলা-দি, কি যে বল তুমি। সত্য বল্‌ছি, জামাইবাবুর শোবার ঘরখানা চমৎকার। বাগানের ভিতরটা সব দেখা যায়। আর তেমনই সাজান।

নিজের দীনতার ইঙ্গিতে অকস্মাৎ অপরকে অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়া অনিলা নিজেও ভিতরে ভিতরে কম অপ্রতিভ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ক্ষুব্ধতার যে অতল সমুদ্র বুকের মাঝে অনুক্ষণ জাগিয়া আছে, প্রকৃতির ঝটিকাঘাতের বিক্ষোভে সে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবেই।

নিজের চোখে নিজের অপরাধ যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, গ্লানিটা তখন ত্রুটিকে ক্ষালন করিবার জন্য চিত্তকে পীড়িত করে। বিস্ময়ের

ভঙ্গীতে অনিলা কহিল, "তাই না কি রে? তুই কেন অমন ঘরের ভাগ নিলিনি?"

অনিলা শুভার মুখের পানে তাকাইল।

বদ্ধ জানালা খুলিয়া দিলে একসঙ্গে আলো ও বাতাস কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার মত আনন্দ ও উত্তেজনা শুভার আঁধার মুখখানাকে মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। প্রফুল্ল কণ্ঠে শুভা কহিল,—"ইস্, তা বই কি? ভাগ পাওয়া এত সহজ না কি? জামাইবাবুকে তো চেন না! এক জন ছাড়া সব গলাধাক্কা!" শুভা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভূমিকম্পে সমুদ্র-দোলার মত মুহূর্ত্তে অনিলার বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। আপনা হইতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "সে এক জন কে রে, শুভা? সুলেখা মিত্তির?"

সোনালী কিরণ-মাখা তরুপল্লবের মত কৌতুকের দীপ্তিতে শুভার চোখ-মুখ ঝল্‌মল করিয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের ভঙ্গীতে কহিল, "না গো মশাই, না। সুলেখা মিত্তিরের সাধ্য কি? বাপ্ রে, সে এক জন মস্ত লোক।"

অকস্মাৎ অনিলা যেন কেমন বদলাইয়া গেল। নদীতে বন্যা আসার মত একটা দুর্নিবার কৌতূহল দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত ধৈর্য্যটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। লোভাকুল নেত্র মেলিয়া শুভার পানে চাহিয়া অনিলা কহিল, "সে মস্ত লোক কে, বল্‌বি নি, ভাই?"

শুভা অনিলার পাশে কার্পেটের উপর শুইয়াছিল। তাহার কোলের উপর মাথাটা রাখিয়া কহিল, "সে এক জনের নাম হচ্ছে 'শ্রীমতী অনিলা বসু।'"

ধাঁ করিয়া শুভার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া অনিলা নিজের পা-টা টানিয়া লইল।

শুভা হাসিয়া কহিল, "সত্যি কথা বল্‌লেই তুমি মারবে।"

অনিলা রাগিয়া উঠিল। পড়ন্ত-বেলার রক্তালোক মাখা আকাশের মত মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে কহিল, "আমি না তোর বড় বোন? আমার সঙ্গে যা-তা ঠাট্টা করতে তোর লজ্জাবোধ করে না?"

নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের অকাট্য যুক্তি হাতে থাকিলে, অভিযোগ যত নিদারুণ হউক না কেন, মানুষ সহজে ভয় পায় না।

অবিচলিত কণ্ঠে শুভা কহিল, "আমি ঠাট্টা করলুম? জামাইবাবুর বল্‌তে লজ্জা করে-নি?"

স্বপ্নের অগোচর সত্যটা হঠাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, বড় জোর সে ধাক্কা দেয়। হাজার শান্ত চিত্তও চঞ্চল হইয়া পড়ে।

প্রতিবাদের কণ্ঠে অনিলা কহিল, "সে তোকে কিছু বলে-নি। তোর মিছে কথা।"

সতেজে শুভা কহিল, "ইস্! মিছে কথা বই কি? মুকাবেলা করাতে পারি।"

ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠার মত ভীত কণ্ঠে অনিলা কহিল, "কি মুকাবেলা করাবি?"

"জামাইবাবু এ কথা বলেছেন কি না।"

অনিলা যেন নিজের মাঝে সমস্ত শক্তিকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। এক দিন যে মানুষ শৈলর সমস্ত যুক্তিতর্ক-প্রার্থনাকে কঠোরতম অবহেলায় নিস্পৃহের মত দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল, এতটুকু বাধে নাই; আজ সে তেজ, দর্প, অহঙ্কার কোথায় সব অন্তর্হিত হইয়া পরমুখাপেক্ষী ভীরু নারীপ্রকৃতি অত্যন্ত অচেনা মূর্ত্তিতে অকস্মাৎ কোথা হইতে বুকের মাঝে আবির্ভূত হইল? অতি সামান্য

মানরীর মত তুচ্ছ ঘরকর্ণা স্বামি-পুত্র, আজ সব চেয়ে কেমন বড় লোভনীয় হইয়া উঠিল!

দীর্ঘকালের রণশ্রান্ত পীড়িত অন্তর একটুখানি স্নেহচ্ছায়ায় জুড়াইতে চাহে। বিচারের আজ প্রয়োজন নাই, প্রবৃত্তিও নাই। তাই যে রহস্যের আঁচ অবধি অনিলা কোন দিন সহিতে পারিত না, আজ সেই কথাটাই সে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

অনিলা কহিল, "কি বলেছেন তোকে, শুনি?"

শুভা হাসিয়া উঠিল, কহিল, "সেইটাই বললে তো হতো। এক দিন ঠাট্টা করে জামাইবাবুকে বলেছিলুম, আপনার এ ঘরের ভাগ নেবে কে? তিনি অমনি জবাব দিলেন—তোমার অনিলা-দি। আমি বললুম, তিনি তো আপনাকে বিয়ে করবেন না।"

অনিলা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিল, কহিল, "তুই এই কথা বল্‌তে পেরেছিলি?"

শুভা কহিল, "কি করব। মা যে শিখিয়ে দিত, জানলে অনিলা-দি। আমি এই কথা বল্‌তেই জামাই বাবু বল্‌লেন, তা হলে আমার আর বিয়ে করা হবে না। আমি বল্‌লুম, এ ভারী মজার কথা। তিনি বাধা দিয়ে বল্‌লেন, এ আমার ভাগ্যচক্র। এ ঘর আমি ছাড়তে পারব না। তা হ'লে স্বর্গে বসে এক জন দুঃখ পাবেন। আর তাঁর দেওয়া ঘরে তাঁর মেয়ে ছাড়া অপরকে আমি ঢুকতে দেব কেমন করে। শুভা, তোমার অনিলাদির দয়ার জন্যই আমাকে বসে থাকতে হবে।"

অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। শুভা কহিল, "যাচ্ছ কোথা?"

কোন উত্তর না দিয়া অনিলা কক্ষ ছাড়িয়া গেল। অনিলার সমগ্র চিত্ত যেন বহু দূরস্থিত এক জনের পদপ্রান্তে উপুড়

হইয়া পড়িয়া তাহার দুই চরণতল অশ্রুতে অভিসিক্ত করিতে লাগিল। অনিলার চোখের জল কপোল, গণ্ড, বক্ষঃকে প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল—ত্যাগ ও কৃতজ্ঞতার মূর্ত্তি লইয়া শৈল যেন অনিলার চোখে দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিল—উচ্ছ্বসিত আবেগে বুকের মাঝে শুধু সেই একই কথা জাগিতে লাগিল। নিজের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে উজাড় করিয়া শ্রীহীন মূর্ত্তি-খানাকে শৈলর কাছে ব্যবধান রাখিবার জন্য এই কঠোর মূর্ত্তি সে ধরিয়াছিল,—এতটা অহঙ্কারের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু দেবতার কাছে উচু-নীচু, আত্ম-পর, ভাল-মন্দ কিছুই নাই। নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করাই প্রকৃত পূজা।

৩৯
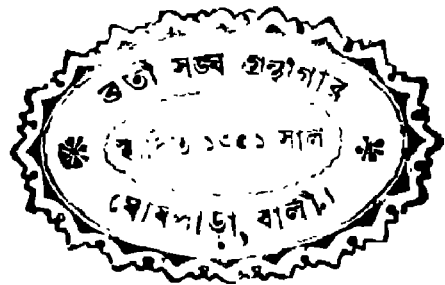
শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈল ভয়ানক চমকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ার মত এক পাশে সরিয়া গেল।

সুলেখা কৌচখানার উপর শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আমাকে দেখে তুমি অবাক হবে জানতুম। কিন্তু এতখানি যে চম্‌কাবে, তা বুঝিনি।"

শৈল কথা কহিতে পারিল না। এই স্বপ্নাতীত ব্যাপারটাকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আঁধারে তাহার নিভৃত শয়নকক্ষে সুলেখার এই অভাবনীয় আবির্ভাবটা তাহার বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছিল।

শৈলর এই একান্ত অভিভূত মূর্ত্তিটা সুলেখাকে যেন একটা আঘাত করিল। মুখখানা তাহার বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু মানুষের ভিতর সহিবার শক্তিটা যত বেশী পরিমাণে আছে, স্রষ্টার হাতের অন্য কোন সৃষ্টিতে বোধ করি ততখানি নাই।

সুলেখা কহিল, "তোমার কাছে আমার আসাটা কি এতই অসম্ভব হয়ে উঠেছে যে, তুমি কিছুতেই আমাকে স্বীকার করতে পাচ্ছ না?"

বিস্ময়াহত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তটা তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। শৈল কহিল, "তোমার নিজের কথার উত্তর যখন নিজেই দিতে পার, তখন আমাকে সে কষ্টটা দিচ্ছ কেন?"

সমুদ্র-তরঙ্গের মত একটা প্রচণ্ড অভিমান সুলেখার বুকের মাঝে দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কত দিন পরে সে শৈলর সমীপে আসিয়াছে, দ্বিধাহীন-চিত্তে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। অভিন্ন, আপনার ভাবিয়া তাহার লজ্জা, কুণ্ঠা কিছু শৈলর কাছে নাই। অন্তরতম প্রদেশের সেই একান্ত প্রিয়, দূরত্বের ব্যবধান রচিয়া বাহিরের আসনে বসিতে চাহিল, বেদনার ভারে সুলেখার সারা চিত্ত যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িল; জানালার সন্নিহিত চেয়ারখানা অধিকার করিয়া শৈল বসিয়াছিল। সুলেখার অবনমিত মুখের পানে চাহিয়া, সে যেন যুগান্তরের কথা ভাবিয়া লইল। কহিল, "তোমার বাবা দেশেই তো আছেন?"

সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে সুলেখা কহিল,—"হ্যাঁ।"

"তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কর-নি?"

তেমনই সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "না।"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দেশ হ'তে সটান এখানে এসেছ?"

তেমনই অবস্থায় থাকিয়া সুলেখা কহিল, "হ্যাঁ।"

আবার সব চুপ-চাপ। পাথরের মত একটা জমাট নিস্তব্ধতা কক্ষটাকে যেন অসাড় করিয়া রাখিল, এবং তাহার কঠিনতা যে কত যন্ত্রণাদায়ক, তাহা মুখামুখি উপবিষ্ট দুইটি নরনারীর চিত্তই সমভাবে উপলব্ধি করিতেছিল; তথাপি নীরবতা ভাঙ্গিবার পথ কেহই যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গ্রহবৈগুণ্যে হঠাৎ যখন নিকটতম জনও পর হইয়া পড়ে, ভাষার অভাব তখন বড় বেশী হইয়া দেখা দেয়। মর্ম্মান্তিক দুঃখের অনুভূতি কথায় প্রকাশের ভাষা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুক্ত বাতায়ন-পথে সাজান বাগানের দিকে চোখ পাতিয়া দুই জনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। পূর্ণিমার চাঁদ তাহার রূপালী আলো পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিল। সদ্য-ফোটা পুষ্পসৌরভ বাতাসের সঙ্গে কক্ষে-

ভাসিয়া আসিতেছিল। শৈল মুখ ফিরাইয়া দিয়া সুলেখার পানে চাহিল। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল। সহসা শৈলর মনে হইল, কুয়াসা-ঢাকা চাঁদের আলোর মত সুলেখার নিষ্প্রভ মুখখানাতে যেন একটা মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত একটা ভয়ের শিহরণ শৈলর সমগ্র অন্তরের উপর দিয়া নিমিষে খেলিয়া গেল। দ্রুত-কণ্ঠে শৈল কহিল, "লেখা—"

সুলেখা শিহরিয়া উঠিল। পলকে শৈলর কণ্ঠে অতীতের স্বর, স্নেহ-সম্ভাষণ জাগিয়া উঠিয়াছে!

শৈল কহিল, "লেখা, আর কি আগেকার দিনের মত আমার কাছে মনের কপাট খুলতে পার না?"

সুলেখা শৈলর মুখের পানে চাহিল, দেখিল, তাহার আয়ত নেত্রের কোমল দৃষ্টির উপর যেন একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তে কি যেন হইয়া গেল।

কঠোর শাসনে প্রতিহত অশ্রুরাশি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া ক্ষিপ্র-গতিতে সুলেখার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল এবং তাহাকে লুকাইতে সে হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

জ্যামুক্ত শরের মত নিমিষে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া শৈল সুলেখার কৌচখানার উপর আসিয়া বসিল। তাহার পিঠে হাত রাখিয়া মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "লেখা, লেখা, আমায় মাপ কর।"

শৈলর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। দীর্ঘ দিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত যে দুঃখ, অভিমান, বেদনার স্তূপ পর্ব্বত আকারে দুই জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, অকস্মাৎ সেটা যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেল।

বেদনার ভার চোখের জলেই লাঘব হয়। বাধাহীন হইয়া তাহার খানিকটা ঝরিয়া পড়িল। শৈলর সাধ্য-সাধনায় সুলেখা মুখ তুলিল।

তাহার অশ্রুধৌত আরক্ত মুখখানি নিজের রুমালে সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া ম্লান কণ্ঠে শৈল কহিল, "নিজের দুঃখটাই বড় ক'রে দেখা মানুষের স্বভাব, সু!"

সুলেখার মনে হইল, শৈলর কণ্ঠস্বর হইতে একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা করুণ অভিযোগের মত ঝরিয়া পড়িল। শৈলর হাতটা সুলেখা মুহূর্ত্তে চাপিয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থাকিয়া নিজের মাঝে সে যেন কত কি ভাবিয়া লইল। তার পর কহিল, "আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

সুলেখার হাতের মাঝে নিজের হাতখানা তেমনই রাখিয়া শৈল কহিল, "বিদায়! যদি বিদায়ই হয়, তবে এতখানি কষ্ট ক'রে তা নিতে আসবার দরকার কি, সু? সে তো অনেক দিন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে, লেখা!"

সুলেখা কহিল, "আমি সে বিদায় বলি-নি। আমি তোমার কাছে হতে একটা বাঁধন নিতে এসেছি। যা মৃত্যু অবধি আমাকে জড়িয়ে থাকবে। তাই এমনি ক'রে তোমার ঘরে একলা ঢুকতে পেরেছিলুম। তুমি তো জান, যে ব্রত আমি নিয়েছি, এতে অনেকের কাছে আমায় যেতে হবে; মানুষের মন, কখন কি দুর্ব্বলতার ফাঁকে কি ত্রুটি, কি অপরাধ কোথায় করে ফেলি, এই আমার ভয়। তাই আমার রক্ষা-কবচের দরকার। তুমি আমায় সেই রক্ষা-কবচ দাও, আমি তাই চাইতে এসেছি, যা আমাকে সকল রকম অবস্থা থেকে রক্ষা করবে।"

শৈল রুদ্ধ-নিশ্বাসে বসিয়াছিল। সুলেখার শিথিল মুঠা হইতে তাহার হাতখানা খসিয়া পড়িয়াছিল। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "সু, দু'জনে মিলে এক দিন যার স্বপ্ন দেখতুম, যে ছবি আঁকতুম, আজ তাকে সত্য করতে তুমি সেই পথে চলে গেলে। কিন্তু

আমার পথ রুদ্ধ। কেন জান? এক পথে যাত্রা করলে পাছে পরস্পরের নিকটে আমরা এসে পড়ি। নিজেকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। তাই যে পথ তোমার খোলা থাকবে, সে পথ আমায় বন্ধ করতে হবে।"

সুলেখা কহিল, "আমি তা জানি। দাদা বলেন, অনিলা তোমায় চায় না। কিন্তু দাদা এটা বুঝতে পারে না; তোমার জীবনে এইটিই সব চেয়ে বড় অগ্নি-পরীক্ষা। ভগবানের কাছে কি মানুষের চোখে তুমি ছোট হয়ে যাও, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। সন্তোষ বাবুর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব কেন জান?"

শৈল চমকিয়া উঠিল। কহিল "কেন?"

সুলেখা শৈলর ম্লান মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে দেখিল। তাহার নিরানন্দ চিত্তের বেদনাটা তাহার নিকট অজ্ঞাত রহিল না।

সুলেখা কহিল, "আমার মনের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারবে না, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। কিন্তু আজ বুঝতে পারলুম, অন্তরে যে কথার গুঞ্জরণ ওঠে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি প্রাণীও তাহার শ্রোতা হয়।" সুলেখা একটু থামিল। কপালের ঘাম রুমালে মুছিয়া কহিল, "যে দিন সন্তোষ বাবুর মুখে জানতে পারলুম, অনিলার সে বিশেষ আত্মীয়, তোমাকেও সে জানে, সেই দিন মনে হ'ল, আমার সব সমাচারটা সন্তোষের মারফত অনিলার কাণে ঢেলে দেব। তা'হলে তোমাকে পেতে তার আর কোন বাধা থাকবে না।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের মত সুলেখার মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "এতে তার বাধা কি ঘুচবে? তোমার কথা

জান্‌তে পারলে তার কি সার্থকতা তার কাছে থাকবে, আমি তো তা বুঝতে পাচ্ছি না, লেখা ?"

বর্ষণক্লান্ত আকাশের বুকে দিনমণির প্রথম মৃদু দীপ্তির মত একটু-খানি মধুর হাসি সুলেখার ওষ্ঠপুটে ফুটিয়া উঠিল। চিরকালের অভ্যাস-মত রহস্যপূর্ণ-কণ্ঠে সে কহিল, "সত্যিকারের ভাল না বাসলে মানুষের মন বোঝা যায় না তা ঠিক, আর মেয়েদের মত পুরুষ তো কোন দিন ভালবাসতে পারে না—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "আমি মেয়ে যখন নই, তখন তাদের ও-জিনিষটা কি রকম, তা বুঝতে পারব না। কিন্তু অনিলার কথা তুমি কি বলছ লেখা, সেইটাই আমি বুঝতে চাইছি।"

সুলেখা কহিল, "আমিও তাই তোমায় বোঝাতে চাইছি। এই আগুনে যে না পুড়েছে, এ যে কি জিনিষ, তা কিছুতেই সে কল্পনায় আনতে পারবে না। যা বলতে যাবে, যা ভাববে, সবই ব্যর্থ হবে। আমি নিজের অন্তর হ'তে উপলব্ধি করেছি, অনিলা আমার কথা ভেবে, তোমার সুখ-চিন্তা ক'রেই এমন ক'রে নিজেকে তফাত করেছে। সে আমার মতই তোমায় ভালবাসে, কিন্তু যে দিন বুঝতে পারবে, আমাকে পাওয়া তোমার কিছুতেই সম্ভব হবে না, সে দিন তোমার কাছে আসতে তার কোন বাধাই থাকবে না। আর সে এলে তুমিও তাকে বিমুখ করতে পারবে না।"

সুলেখা পূর্ণ-দৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিল।

শৈল কহিল, "না, আমি তা পারব না। সে আমার কাছে এলে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত তাকে আমি গ্রহণ করব। তার বাবার অন্তিম ইচ্ছা আমার বুকের মাঝে অনুক্ষণ জেগে আছে।"

শৈল থামিল, একটু চিন্তা করিল। তার পর সুলেখার হাতখানা

নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আঙ্গুলের আংটীটা খুলিয়া স্থলেখার আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। কহিল, "এই নাও, সু! শৈলর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

সুলেখা কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু নত হইয়া শৈলর পায়ের ধূলা লইল। শৈল তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল, "আজ তোমাকে ছাড়ার সঙ্গে আমার নিজের কতখানি ছাড়ছি, এ শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। তোমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করাতে যদি কোন অন্যায় হয় তো আমার বুকের মাঝে চেয়ে তিনি ক্ষমা করবেন!"

শৈলর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। বুঝি মর্ম্মান্তিক ব্যথার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম বলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত থামিল। তার পর কহিল, "আমার মৃত শ্বশুরের ভালবাসাকে স্মরণ ক'রে তোমায় বিদায় দিলুম, লেখা! জন্মের মত তোমার সম্বন্ধ ত্যাগ করলুম। তুমি আমার কাছ থেকে স্মৃতিচিহ্ন নিলে, কিন্তু আমি অতি সামান্য একটা কিছুই তোমার কাছ হতে নিতে পারলুম না। যা তুমি আমি ছাড়া জগতের তৃতীয় প্রাণীও জানত না, তাও আমি পারব না। আমাকে কায়মনো-বাক্যে অন্যের হ'তে হবে। এ-ঘর আমার শ্বশুরের হাতে সাজান, তাঁকে ক্ষুব্ধ করতে কিছুতেই আমি পারব না।"
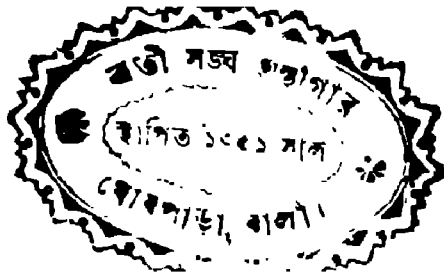
৩১

বিরজামোহন দ্রুতপদে সিঁড়িগুলা অতিক্রম করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ত্রিতলে আসিলেন, ব্যস্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "অলু কোথা রে ?"

"এই যে জ্যাঠামশাই" বলিয়া অনিলা কক্ষের বাহিরে আসিল।

বিরজামোহন কহিলেন, "পাটনা হ'তে তার এসেছে, শৈলর ভারী অসুখ।"

একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ভয়ের অন্ধকার নিমিষে যেন অনিলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং তাহার পায়ের তলায় পৃথিবীটা দুলিয়া উঠিল। নিজের পতনটা রক্ষা করিতে পাশের রেলিংটা সে চাপিয়া ধরিল, কহিল, "জ্যাঠামশাই! পাটনার ট্রেণ ক'টায় ? আচ্ছা, আমার ঘরে টাইম-টেবল আছে।"

অনিলার বিমর্ষ মুখ, কম্পিত ওষ্ঠাধরের পানে চাহিয়া বিরজামোহনের অন্তরও বেদনায় ভরিয়া উঠিল। বাস্তবিক শৈলকেও তিনি স্নেহ করিতেন। তাহার পীড়ার সংবাদটা তাঁহার অন্তরে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমি জানি, মা। রাত্রি আটটার সময়ে!"

অনিলা কহিল, "এখন তো বেলা বারটা। না, আমি আট ঘণ্টা দেরী করতে পারব না।"

জয়ন্তী কহিলেন, "তুমি তবে যাবে কি এরোপ্লেনে ?"

অনিলা জয়ন্তীর কথায় সাড়া দিল না। তাঁহার পানে চাহিয়াও দেখিল না। বিরজামোহনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি আমার অভিভাবক হ'য়ে আমার বাবার স্থলে বসে আছেন।" অনিলার কণ্ঠস্বর দৃঢ়! অন্তরের একটা কঠিন সঙ্কল্পের দীপ্তি সমগ্র মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল।

বিরজামোহনের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "সে তো নিশ্চয়ই, মা।"

"তবে বাবা থাকলে তিনি যে কায কর্‌তেন, আপনিও তা করুন।" অনিলার কণ্ঠস্বরে কর্ত্তৃত্বের সুর ধ্বনিয়া উঠিল, কহিল, "আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবনী বাবুর বাড়ী আপনি ট্যাক্সী করে যান। বাবার মোটর তিনিই কিনে রেখেছেন। আমি চাইলেই পাব। সেই গাড়ীতেই আমি পাটনা যাব।"

সবিস্ময়ে বিরজামোহন কহিলেন, "তুমি মোটরে পাটনা যাবে?"

অনিলা উত্তর দিল, "আমি বাবার সঙ্গে মোটরে অনেক স্থানে গেছি। কোন ভয় নেই।"

নিশ্চিত পরাজয়টা যত আসন্ন হইয়া আসে, বিপক্ষের উপর ক্রোধটা ততখানি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে—হিংসা প্রবৃত্তি তেমনই উগ্র হইয়া উঠে।

জয়ন্তী তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার সঙ্গে যাবে কে? এই বুড়ো মানুষটি? না, আমি ওঁকে এ-ভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।"

জয়ন্তীর প্রকৃতি অনিলা জানিত। জানিত না তাহার চরমটা কোন্‌খানে। মানুষের সর্ব্বনাশের মুখেও যে হৃদয় অটল, অচল অদ্রির মতই নিজেকে স্থির রাখিতে পারে, এটুকু সে কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। কিন্তু সত্য যে কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার উদাহরণের অভাব ঘটে না।

অনিলা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই ভিতরে ভিতরে নিজেকে ঝাড়া দিয়া সে যেন নিজেকে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইল। অনিলা বিরজামোহনকে কহিল, "সুন্দর সিং আমাদের এতটুকু বেলা হ'তে দেখেছে। সে-ই অবনী বাবুর ওখানে সোফার হয়ে আছে। সে-ই গাড়ী নিয়ে আসবে। আমার কাউকেই প্রয়োজন নেই। আমিই গাড়ীর ব্যবস্থা করতে অবনী বাবুর ওখানে যাচ্ছি।"

উগ্র ক্রোধ, মদের নেশার মত মানুষকে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ভাল-মন্দটা বুঝিতে দেয় না। জয়ন্তী অনিলার কথার মাঝে "প্রয়োজন নেই," শব্দের মর্ম্মটা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেটা পারিলেন বিরজামোহন। তাই তিনি ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি স্নেহের পরিমাপটা বর্ষার নদীর মত হঠাৎ এত বৃদ্ধি পাইল যে, সবেগে কহিলেন, "না, না, তা কি হয়। তুমি কি আমার রক্তের টানের জিনিষ নও, বাছা! আমি তোমায় একা ছাড়তে পারব না। আমি তোমার সঙ্গে যাবই।"

গম্ভীর কণ্ঠে অনিলা কহিল, "বেশ, আমার ট্যাক্সীতে আসুন। হ্যাঁ, ওঁর দাদাদেরও একটা সংবাদ দেওয়া উচিত।"

এক ঘণ্টার মধ্যে অনিলা নিজেদের আবশ্যক জিনিষপত্র গুছাইয়া সোফার সুন্দর সিংকে সঙ্গে লইয়া পাটনায় রওনা হইতে মোটরে উঠিল। তখন সর্ব্বনাশা ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে স্তব্ধ আঁধার মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিরজামোহনের বুঝিতে বাকী রহিল না, এ বাড়ীতে তাঁহাদের থাকা শেষ হইয়া গেল।

স্বামীর বিষণ্ণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? মেয়েমর্দ্দানী হয়ে ভাইঝি তো গেল ভগ্নীপতির সেবা করতে!"

বিরজামোহন স্ত্রীর মুখের পানে একটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, দেখ, "জাল-বোনা জিনিসটা ভারী বিশ্রী। মাকড়সা নিজের জালে নিজেই শেষে বন্দী হয়। যেমন আমরা হলুম।"

জয়ন্তী কহিলেন, "আমরা জালে বন্দী হলুম কিসে? ওর ওই ভগ্নীপতির সেবা করতে যাওয়া বার করব। তাই বুঝি চির-কুমারী থাকবার কঠোর সঙ্কল্প। আত্ম-পরিজনের কাছে তো মুখ দেখাতে হবে।"

বিরজামোহন রাগিয়া ছিলেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আত্ম-পরিজনের কাছে সবাইকে মুখ দেখাতে হবে। আমরাও তা হতে বাদ পড়ব না।"

জয়ন্তী কহিলেন, "আমরা এমন কোন কায করিনি যে, মুখ দেখাতে লজ্জা পাব। শুভাকে নিয়ে যেমন শৈলর বাড়ীতে দু'মাস ছিলুম, আমার মনে যাই থাক, সে বিচার তো হবে না। শুভা তার বাপ-মার সঙ্গেই ছিল, এ কথা সবাই জানে; এইবার বুঝবে বাছাধন, কে জিতলো।"

মানুষ নিজের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া যখন হার-জিত বিচার করে, তখন সে একটা বড় বোকামী করিয়া বসে।

বিরজামোহন কহিলেন, "তা হ'লে জিতের খেলা এখন তোমার।"

সদর্পে জয়ন্তী জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার মুখ থামাবার জন্য অনিলা নিজে গিয়ে শৈলকে ধর্‌বে, শুভাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে। এটা ঠিক জেন, সৃষ্টি রসাতলে যেতে বস্‌লেও শৈলর দ্বারা অনিলার কথা হেলা করা সম্ভব হবে না।"

"আর যদি অনিলা সে অনুরোধ না করে?"

জয়ন্তীর ওষ্ঠাধরে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "কর্‌বে না তো কি? এ ভিন্ন তার উপায় কি আছে?"

"আসুন" বলিয়া সুকুমার অগ্রসর হইল। একটা দুর্নিবার কৌতূহলের বশে সুকুমারের এই মেয়েটির সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা হইতেছিল; নিজেই পরিচয়টা জানাইয়া দিয়া শৈলর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে। পিতা ও ভগিনীর মুখে এই তরুণীটির টুক্‌রা টুক্‌রা কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহাকে জোড়া-তাড়া দিলে মনোরাজ্যে বিচিত্র হেঁয়ালির আভাস পাওয়া যায়—যাহা অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত হইয়া উঠে।

একটা কক্ষের সম্মুখে আসিয়া উভয়ে থামিল এবং পর্দ্দা তুলিয়া পায়ের সাণ্ডাল খুলিয়া অনিলা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

অনিলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, শুভার বর্ণিত এ-সেই সুরম্য সজ্জিত শৈলর শয়ন-কক্ষ। ভূমিকম্পে সমুদ্র-দোলার মত তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা মুহূর্ত্তে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সম্মুখের দেওয়ালে পিতার সুবৃহৎ তৈল-চিত্র। এক পাশে খাটের উপর শৈল চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। রৌদ্রতাপে শুষ্ক ফলের মত প্রচণ্ড জ্বরের উত্তাপে তাহার কমনীয় মুখখানাকে ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত অবয়বের উপর কঠিন রোগ তাহার নিষ্ঠুর যন্ত্রণার চিহ্ন যেন সদর্পে আঁকিয়া নিজের আগমনের পরিচয়টা সকলের চোখে সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছে। পাশের মার্ব্বেল টেবলে ঔষধের শিশি, কৌটা, থার্ম্মোমিটার, ফিডিং কাপ, মেজার গ্লাস, রোগের রিপোর্ট লিখিবার ও টেম্পারেচার রেকর্ড করিবার খাতা ইত্যাদি পীড়িতের পরিচর্য্যার যাবতীয় জিনিস সাজান রহিয়াছে। নিকটে টুলের উপর একটা বিহারী ভৃত্য বসিয়া শৈলর মাথায় আইসের ব্যাগটা ধরিয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ শৈলর মুখের পানে স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অনিলা ধীরে ধীরে সেই মার্ব্বেল-টেবলটার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পীড়িতের বিধি-বিধানের খাতাখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে সেখানা পড়িতে

পড়িতে ঔষধ-সেবনের সময়গুলা দেখিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া মনে মনে কি হিসাব করিয়া লইল।

হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলিতেই অনিলার চোখে সুকুমার পড়িল। সে-ও অনিলার মতই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পরম বিস্ময়ে অনিলার কার্য্য-কলাপগুলাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

অনিলা ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিল। সুকুমার কাছে আসি-তেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি এই সব লিখেছেন?"

সুকুমার উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

"কিন্তু দু'রকম হাতের লেখা দেখ্‌ছি কেন? প্রথম দু'দিনের সঙ্গে তো এ তিন দিনের লেখা মিল খাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে।"

সুকুমার কহিল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। প্রথম দু'দিন আমার বোন সুলেখা রোগীর পরিচর্য্যা করেছিলেন। কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়—"

অনিলা কহিল, "তাই আপনার হাতে পড়েছে। আচ্ছা, জ্বরটা তো টাইফয়েড। রক্ত-পরীক্ষা হয়েছিল?"

সুকুমার চমকিয়া উঠিল। শিক্ষিতা নার্শের মত অন্তঃপুর-বদ্ধা হিন্দুর ঘরের মেয়ে যে রোগের খুঁটি-নাটি সম্বন্ধে কথা কহিতে পারে, তাহা সুকুমারের জানা ছিল না।

সে কহিল, "হ্যাঁ, টাইফয়েড। ব্লাডে তাই পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ বলেট জ্বরের গতির লক্ষণ দেখে প্রথম হতেই সন্দেহ করেছিলেন।"

অনিলা পুনরায় ফিরিয়া শৈলর মুখের পানে, নিমীলিত নেত্রের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল। পীড়িতের নিশ্বাস গ্রহণ ও পতনের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, "প্লালসের বিট কাউণ্ট করা, ব্রীদ কাউণ্ট করার তো কিছু রিপোর্ট দেখছি না। ডাক্তার

বলেট কি এ-সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন-নি? এটা তো দ্বিতীয় সপ্তাহ চল্‌ছে।"

সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই অপরিচিতা তরুণীটির একটা দিকের পরিচয় সে কিছু কিছু অবশ্য জানিত। কিন্তু তাহার কল্পনার বাহিরে অসাধারণ আর একটা দিক্ অকস্মাৎ সুকুমারের মনের মূল অবধি নাড়িয়া দিল এবং দপ্ করিয়া বিদ্যুৎরেখার মত মাথার ভিতর খেলিয়া গেল; করুণার পাত্রী বলিয়া ইহাকে অনুকম্পা দেখানো শুধু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া।

অনিলা আবার কহিল, "দেখুন, ওঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে, যেন হার্টের ট্রাবল আরম্ভ হয়েছে।" অনিলা সুকুমারের পানে চাহিল।

হার্টের সম্বন্ধে ডাঃ বলেট যে আজ একটু চিন্তান্বিত হইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইঙ্গিতে সেটুকু অনিলাকে জানাইয়া গভীর শ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠে সুকুমার কহিল, "উনি নার্স দেখ্‌তে পারেন না। আমি একলা মানুষ, লোকজনের সাহায্য নিয়ে যা করি। কিন্তু আপনার কাছে স্বীকার কর্‌তে আমার লজ্জা নেই, আপনাকে দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, সেবার সম্বন্ধে আমি সব চেয়ে বড় আনাড়ি।"

একটু থামিয়া সুকুমার কহিল, "তবু এখন খানিকক্ষণ আমি চালাতে পারব, আপনি একটু বিশ্রাম নিতে, কাপড় বদ্‌লাতে যাবেন না?"

"আমি? না, আমার এখন ও-সবে কোন প্রয়োজন হবে না। আমি সময়মত সব ক'রে নেব। ডাক্তার তো এসেছিলেন?"

"নিশ্চয়। একটু আগেই তিনি এসেছিলেন। আমি মোটরে ক'রেই ঔষধ আনতে পাঠিয়েছি।"

অনিলা শৈলর বিছানার দিকে সরিয়া গেল। কহিল, "আমি একেবারে ঔষধ দিয়েই যাব। আপনি যে রাত্রি জেগেছেন, দেখেই

বুঝতে পাচ্ছি। পাশের কোন ঘরে আপনি একটু ঘুমনগে। প্রয়োজন হ'লে খবর দেব।"

অনিলা ভৃত্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বরফের থলিটা ভরিয়া আনিতে বলিল এবং নিজে রুমাল দিয়া শৈলর কপালের জলগুলা মুছিয়া দিয়া থলিটাকে সে ভাল করিয়া ধরিল।

সুকুমার কক্ষ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। এই কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচিতা তরুণীর অটুট গাম্ভীর্য্যভরা মূর্ত্তি, কর্ত্তৃত্ব করিবার অসাধারণ শক্তি, তাহার অন্তরের প্রচণ্ড বিস্ময়ের উপর সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া-উঠা নদীর জলের মত একটা গভীরতর শ্রদ্ধা ক্ষণে-ক্ষণে ঝল-মল করিয়া উঠিতে লাগিল। নির্ভরতার মুহূর্ত্তে আশ্রয়ের শক্তির পরিমাণটা যখন মানুষ খোঁজে, তখন তাহার সৌন্দর্য্য-বিচার আসে না।

৩৩

কঠিন পীড়ায় চিকিৎসার যতখানি প্রয়োজন, তাহার চেয়ে বেশী প্রয়োজন পীড়িতের শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা। সেবার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পীড়িতকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইবার সুবিধা পায়।

লুব্ধনেত্র মেলিয়া মৃত্যু যেমন শৈলর পাশে দাঁড়াইয়া সুবিধা ও অবসরকে খুঁজিতেছিল, ঠিক তাহারই মত অতন্দ্র নেত্র মেলিয়া ক্লান্তি-হীন দেহে অনিলা সেবার দু'বাহু মেলিয়া শৈলর পাশে বসিয়াছিল।

একুশটা দিন কাটিয়া গেল। পাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদের মৃদু দীপ্তির মত চিকিৎসকের মুখে যে একটা আশার আনন্দ দেখা দিয়াছে, অনিলার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহা ধরা পড়িল।

সে-দিন বিদায় লইবার সময়ে ডাক্তার বলেট জানাইয়া গেলেন, এই সপ্তাহটা গত হইলেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হইতে পারিবেন এবং তাহা যে হইবে, সে বিষয়ে তিনি দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন।

সুকুমার আসিয়া শৈলর কক্ষে প্রবেশ করিল। অনিলার পানে চাহিয়া কহিল, "আজ তো ইনি ভাল আছেন,—ডাক্তার বলে বলে গেছেন।"

অনিলা সায় দিয়া জানাইল, "হ্যাঁ, আমিও তা দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

সুকুমার কহিল, "তবে আপনি একটু বিশ্রাম করুন না। আমি এ বেলাটা মিষ্টার রায়ের কাছেই থাকব।"

অনিলা একবার শৈলর মুখের পানে তাকাইল, সমস্ত দেহটা তাহার ভিতরে ভিতরে বিশ্রামের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। খাট হইতে সে নামিয়া পড়িল।

কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া আরোগ্যের পর রোগীর প্রথম হাঁটার মত অনিলার মনে হইল, তাহার পা দু'টা যেন শিথিল, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কোন মতে সেই কম্পিত চরণ দু'টা টানিয়া সে কক্ষের বাহিরে গেল।

সুকুমার অনিলার এই অস্বাভাবিক চলার দিকে চাহিয়াছিল। দুয়ারের পর্দ্দাটা টানিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুভার বস্তুর পতনশব্দে সে কক্ষের বাহিরে ছুটিয়া আসিল এবং বিদ্যুতের মত যে সন্দেহটা মনে আসিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। অনিলার মূর্চ্ছিত দেহটা মাটীতে পড়িয়াছিল।

বিব্রত বিপন্ন দৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া সুকুমার একবার চারি পার্শ্বে চাহিল। শৈলর পত্নীহীন গৃহস্থালীতে নারীর সন্ধান মেলা দুঃসাধ্য বস্তু মেলার মতই একটা দুরূহ ব্যাপার। একটা আয়া অবধি সে রাখে না। এখন অনিলার সংজ্ঞা-লুপ্ত দেহটার পরিচর্য্যা চলিবে কাহার সাহায্যে? শৈলর বিছানা হইতেই একটা বালিশ আনিয়া, সুকুমার অনিলার মাথাটা তাহার উপর তুলিয়া দিল। বেহারা, বয় প্রভৃতি সব ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের একখানা হাত-পাখা আনিতে আদেশ করিয়া গোলাপ-জলের স্প্রেটা দিয়া সুকুমার অনিলার রুক্ষ চুল ও ললাটকে ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বুঝিতে পারিয়াছিল, দেহ ও মনের অমানুষিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়ার ফলে চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছে। অসহায়ার উপর—বিপন্নের উপর দয়া, মায়া, স্নেহ না ডাকিতেই আসিয়া পড়ে। করুণ চোখে

সুকুমার অনিলার পানে চাহিয়া তাহার লুপ্ত সংজ্ঞাকে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

মাথায় বরফ দিতে দিতে অনিলা চোখ মেলিল। নিকটেই সেবারত সুকুমারকে দেখিয়া ত্রস্তে সে উঠিয়া পড়িতে উদ্যত হইল। অনিলার সঙ্কুচিত মুখের পানে চাহিয়া সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আপনি আর একটু এইখানে হাওয়াতে যদি শুয়ে থাকেন, তবে আমি মিষ্টার রায়ের কাছে থাকব। নয় তো আমাকে এইখানেই দাঁড়াতে হবে।"

অনিলা সম্মতি দিল। তাহার উদ্বিগ্ন শ্রান্ত দেহটা একান্ত নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিবার সামান্য একবিন্দু শক্তি ছিল না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া শৈল চারি দিকে চাহিতেছিল, সুকুমার ডাবের জল ফিডিংকাপ লইয়া শৈলকে খাওয়াইয়া রুমালে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিল।

শৈল সুকুমারের হাতটা ধরিয়া কহিল, "তুমি যদি না থাকতে—"

সুকুমার একটু হাসিয়া কহিল, "তাতে তো বিশেষ কোন ক্ষতি হতো না।"

কঠিন পীড়ার পর চিত্ত শিশুর মত সরল, অকুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। শৈল কহিল, "আমার কি হতো, কে দেখতো?" আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসে নিঃসহায় রোগশয্যাটা মনে উদয় হইবামাত্র শৈল কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুমার তাহার কৃশ দুর্ব্বল হাতখানার উপর ভালবাসার একটা মৃদু চাপ দিয়া কহিল, "এ কি পাগলামি কচ্ছেন? কোন অভাবই হতো না। যে দেখছিল, যার চেয়ে বেশী কেউ পারত না, সেই দেখতো।"

আগ্রহভরে ক্ষীণকণ্ঠে শৈল কহিল, "সে কে? কে আমায় দেখেছিল?" মনে মনে সে যেন কি একটা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল।

হাসিয়া রহস্যভরে সুকুমার কহিল, "তিনি হচ্ছেন আপনার ভয়ানক সম্মানিতা—এই যে, ছাই, বাংলায় কি বলে,—জীবন, হ্যাঁ হ্যাঁ—জীবনসঙ্গিনী।"

"লেখা—লেখা? আছে এখানে? নদীর কালো জলে যেন চাঁদের আলো পড়িল। শৈলর মুখ ক্ষণিকের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, আমার জ্বরের প্রথম রাত্রে বড্ড মাথার যাতনা হচ্ছিল, সেই তো মাথা টিপে দিচ্ছিল।"

শৈল আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সুকুমার কহিল, "মিষ্টার রায়, কি বলছেন? আপনাকে মৃত্যুর মুখ হ'তে ফিরিয়ে কে আন্‌লে জানেন? মিস্ বোস্।"

"মিস্ বোস্? অনিলা? সে কি এসেছে?"

সুকুমার শৈলকে ঔষধ সেবন করাইয়া কহিল, "শুধু আসেননি, ট্রেণে আসতে বিলম্ব হ'বে বলে এতটা পথ একা তিনি মোটরে এসেছেন। আর সেই যে আপনার পাশে বসেছিলেন, ডাঃ বলেট যখন আজ বললেন—আপনি ভাল আছেন, জান্‌তে পেরে অনেক অনুরোধে তবে উঠে গেলেন। মিষ্টার রায়, সেবা যে কি জিনিষ, মিস্ বোসকে দেখে আমি তা উপলব্ধি করেছি।"

প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে যে নারী তাহাকে রক্ষা করিল, অন্তরের কৃতজ্ঞতা তাহাকে জানাইবার জন্য শৈলর সারা চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "অনিলা কই? ডাক না তাকে?"

সুকুমার উত্তর দিল, "তিনি এইমাত্র মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। আমি জোর করে তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিয়ে এসেছি।"

সবুজ আলোয় কক্ষ ভরিয়াছিল। সন্ধ্যার বাতাস সদ্য-ফোটা পুষ্প-সৌরভ বহন করিয়া বাতায়ন-পথে ছুটিয়া আসিয়া গৃহাভ্যন্তর আমোদিত করিতেছিল। অনিলা টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শৈলর জন্য হরলিক্ প্রস্তুত করিতেছিল। বৈকালে মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সে স্নান করিয়াছিল। আর্দ্র চুলের রাশ নিবিড় কালো হইয়া পিঠ ছাড়িয়া জানুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলা বাতাসে উড়িয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। বাঁ-হাতে সেগুলা সরাইতে সরাইতে বিরক্ত হইয়া এক সময়ে অনিলা 'আঃ!' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলিল।

শৈল তাহার মুখের পানে অনিমেষ দৃষ্টি পাতিয়া শুইয়াছিল। হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"চুলগুলো ভারি দুষ্ট, না, অনু?"

অনিলা চমকিয়া উঠিল। এতখানি রোগের মাঝে বিকারের ঘোরে প্রলাপ-বাণীতে শৈল অনেক কথাই বলিয়াছে। সুস্থ হইয়াও তাহার সহিত অনেক কথাই কহে, অনেক গল্প করে; কিন্তু এমন ছেলেমানুষী স্বর বা ভাষা না-পীড়িত, না-সুস্থ, কোন অবস্থাতেই তাহার মুখ দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। এদিকে সে যেন বেশী সচেতন।

মনের সব কথা মুখ দিয়া না প্রকাশ করিলেও তাহার ছায়া মুখে আসিয়া পড়ে। অনিলা হরলিক্ লইয়া শৈলর কাছে আসিতেই শৈল

তাহার আনত নেত্র—ঈষৎ আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া তেমনই কোমল কণ্ঠে কহিল, "তোমার রাগ হলো, অনু ?"

শৈল অনিলাকে অনিলা বলিয়াই সম্ভাষণ করিত, আজ অকস্মাৎ সেই নামটা দুটি অক্ষরের মাঝে পর্য্যবসিত করিয়া অনিলার কুমারী-বুকে যেন বার বার একটা দোলা দিতেছিল। নিজের নামটাই যেন নিজের কাণে সুধা বৃষ্টি করিল।

স্নিগ্ধ-সকৌতুক হাস্যে শৈল অনিলার মুখের পানে চাহিয়াছিল। কাজেই অনিলার আর নীরব থাকা হইল না। এই একান্ত পর-মুখাপেক্ষী দুর্ব্বল ব্যক্তিটির মুহূর্ত্তগুলা সেবা, যত্ন, রঙ্গ, কৌতুক, হাস্য-পরিহাস লইয়া বন্ধুর স্থান—নিকটতম আত্মীয়ের স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই বিশ্বাস সে জন্মাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ অনিলার চোখে ধরা পড়িল—স্নেহ, সৌহার্দ্দ্য দিয়া যে সখ্যতার বন্ধন সে স্থাপিত করিয়াছিল, শৈল যেন তাহা অতিক্রম করিয়া আরও কিছু দাবী করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে বাধা না দিলে হয় তো—হয় তো—অনিলা আর চিন্তা না করিয়া ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে কহিল,—"কি সব ছেলে-মানুষী বকছেন ? নিন, খেয়ে ফেলুন। তখন তো একবার ধরলেন খাব না।"

তৎক্ষণাৎ শৈল কহিল, "ইস্, এখন বুঝি আর—"

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া অনিলা কহিল, "তবে আমায় দিয়ে করালেন কেন ? বললেন তো খাব ?"

শৈল কহিল,—"তখন কি তুমি রাগ করেছিলে ?"

অনিলা কহিল,—"আমি রাগ করেছি ? কে আপনাকে বললে ?"

দুর্ব্বল দেহ-মনে বাহানাগুলা যেমন অদ্ভুত হয়, জেদগুলাও তেমনই দৃঢ় হইয়া উঠে। অনিলা বিপদ গণিল। আত্মগোপন করিবার যে দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মটা সে পরিয়াছিল, নিজেকে নিরাপদ করিতে অকস্মাৎ তাহা খসিয়া পড়িল। হাসিয়া ফেলিয়া সে কহিল, "নাঃ, আপনার জ্বালায় আর পারব না!"

শৈলও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তোমায় বড্ড জ্বালা দেই না, অনু? আচ্ছা বল, তোমার মুখ কেন লাল হলো? তুমি আমায় আর আপনি বলতে পারবে না? কেমন, এই না!"

রাগত কণ্ঠে অনিলা কহিল, "আমি জানি না।"

শৈল খপ্ করিয়া অনিলার হাতটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, "এইবার আমায় ছুঁয়ে বল দিকি, কেমন জান না কি না?"

তাহার আয়ত নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জনকের সুবৃহৎ তৈল-চিত্রের পানে চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলা মাথা অবনত করিল।

শৈল তাহাকে সস্নেহে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "বল, অনু, আর তোমার আপত্তি রইল না—এ-বাড়ী, এ-ঘর আমরা দু'জনে সমান অধিকারে ভোগ করব?"

মৃদু কণ্ঠে অনিলা কহিল, "না, কোন আপত্তি নইলু না। কিন্তু আমার ভয় করে, তুমি কি আমাকে নিয়ে সুখী—"

"সুখী!" শৈল একটুখানি হাসিল। অনিলার দৃষ্টিতে সে হাসি বড মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

শৈল কহিল, "অনু, তোমার কাছ হ'তে আমি যা পেয়েছি বা পাচ্ছি, তা'তে তোমাকে অদেয় জগতে আমার কোন কিছুই কি থাকতে পারে?"

"কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিনিময় ভালবাসা নয়।"

শৈল কহিল, "এ কথা আগে খাটত। কিন্তু এখন নয়। সে-দিন তোমার বাবার জন্যেই তোমায় চেয়েছিলুম, আজ তোমার জন্যই তোমায় চাইছি। তোমার মূল্য আমার নিজের মূল্যের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশী বোধ হচ্ছে।"

পুলকের শিহরণে অনিলার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কুরূপা সে। অঙ্গহীনা সে। তথাপি সে স্বামীর কাঙ্ক্ষিত পত্নী হইতে পারিবে।

সমাপ্ত